স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) ও মৎস্য উপ-কমিটির নারী সদস্যদের বাড়ীর আঙ্গিনার পুকুরে, পার্শ্ববর্তী অল্প জমিতে এবং জলাভূমিতে মৎস্য চাষ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সেপ্টেম্বর ২০২০

এলজিইডি সদর দপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		৫
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কার্যক্রম		৬
পটভূমি		৬
লক্ষ্য		৬
নারীর অংশগ্রহন		৬
অধিবেশন - ১	উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম	৭
	উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য	৭
	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম	৮
	উপ-কমিটি গঠন	৮
	সদস্য ও উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন	৮
অধিবেশন - ২	মাছ চাষে নারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, মাছ চাষে নারী, মাছ চাষে নারীদের বাড়তি আয়, সংসারে নারীর অধিকার ও ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং পুষ্টি সমস্যা সমাধানে নারীর ভূমিকা	৯
অধিবেশন - ৩	বাড়ীর আঙ্গিনার পুকুরে মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহন- কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, মৌসুমী পুকুরে থাই কৈ / ভিয়েতনামী কৈ এবং জিওল মাছ, থাই সরপুটির চাষ ও তেলাপিয়া মাছের চাষ।	১১
	৩.১: কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ	১১
	৩.২ : থাই কৈ/ ভিয়েতনামী কৈ এবং জিওল (শিং)মাছের চাষ	১৭
অধিবেশন - ৪	কার্প নার্সারি ব্যবস্থাপনা	১৯
অধিবেশন - ৫	বসত বাড়ীর আঙ্গিনার এক টুকরো জমিতে চৌব্বাচ্চায় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নারীর উদ্যোগে থাই কৈ, ভিয়েতনামী কৈ, তেলাপিয়া, শিং মাছ কিংবা গলদা চিংড়ির চাষ	২৭
	৫.১ বায়োফ্লক মৎস্যচাষ	২৭
	৫.২ বায়োফ্লক সম্মন্ধে প্রাথমিক ধারন	২৭
	৫.৩ : বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে দুই ভাবে মাছ চাষ করা যায়	২৭
অধিবেশন - ৬	পাবসস এর খালে ছোট ছোট খাঁচায় তেলাপিয়া মাছের চাষ	৩৭
অধিবেশন - ৭	পাবসস এর খালে ছোট ছোট বাক্সে / জলাশয়ের ডিচ বা গর্তে কুচিয়ার চাষ	৪৩
	সার আলোচনা	৪৬

ভূমিকা

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠি নারী যাদের অধিকাংশই বাস করে গ্রামে। সুতরাং গ্রামীন নারীর জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা বিবেচনায় এনে এলাকাভিত্তিক গ্রামীন নারীর জন্য নারীবান্ধব কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বি করা যেতে পারে। এ লক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় নির্মিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যভূক্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যাতে করে সকল কার্যক্রমে নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী থাকে। উপ-প্রকল্প নির্মাণে মাটির কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) নিয়োজিত হয়। এলসিএস এর সদস্যভুক্ত হয়ে নারীরা উপ-প্রকল্প নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং কর্মসংসংস্থানের সুযোগ ও পারিবারিক আয় বর্ধনের লক্ষ্যে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উপ-প্রকল্প এলাকায় টেকসই মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের বসতবাড়ী ভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষে অংশগ্রহন, মাছ উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবে। আগ্রহী নারী বসত বাড়ী সংলগ্ন এক টুকরো জমিতে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে চৌব্বাচ্চায় মাছ উৎপাদন, পাবসস এর খালে খাচায় তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনে সহায়ক হবে। মাছ চাষ এবং মাছের পোনা উৎপাদনে মৎস্য নার্সারী কার্যক্রমে অধিকতর পারদর্শী হয়ে উঠবে। উপ-প্রকল্প এলাকাধীন বসবাসকারী নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। নিজস্ব চাহিদার অতিরিক্ত বা বাড়তি মাছ ও মাছের পোনা বাজারজাত করতে পারবে। আয়বৃদ্ধি করে নিজ পরিবারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কার্যক্রম

পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেল এর অন্যতম উপাদান উপজেলা সেচ কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন করে আসছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বা ২,৫০০ একর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ এবং ভূপরিস্থ পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাঁধ, স্লুইস গেট, রেগুলেটর ও সেচ নালা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার এবং খাল পুনঃখনন বা খনন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত এলাকায় পানি সম্পদ বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা চূড়ান্তকরণের পর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। নির্মিত অবকাঠামোসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উপ-প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৯৫-২০০২ সালে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা ও ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর সহ সর্বমোট ৩৭ জেলায় ২৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মিত হয়। এই সমস্ত উপ-প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, পানি সম্পদ অবকাঠামোর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। উক্ত সফলতার আলোকে ২০০২-২০০৯ সালে এডিবি ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়। এছাড়া জাপান সরকারের সহায়তায় ২০০৫-২০০৬ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৬ জেলার পানি সম্পদ উন্নয়ন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়। এই প্ল্যানের ভিত্তিতে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র আর্থিক সহযোগিতায় ২০০৮-২০১৬ সালে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৪২টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়। এরই মধ্যে ২০১০-২০১৮ সালে এডিবি ও ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬১ জেলায় ২৯০টি নতুন উপ-প্রকল্প নির্মাণ এবং ইতোপূর্বে নির্মিত উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা এবং চট্রগ্রাম বিভবাগের তিনটি পার্বত্য জেলাসহ মোট ২৭টি জেলায় ৫০টি নতুন প্রকল্প এবং ইতোপূর্বে নির্মিত ২৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। একই বছর একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় জাইকার আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

লক্ষ্য ঃ

দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অলোকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে ১৪৫টি নতুন প্রকল্প নির্মাণ এবং প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ১৩৬টি উপ-প্রকল্পে অতিরিক্ত উন্নয়ন ও ৯টি উপ-প্রকল্প মডেল হিসেবে ফ্লাগশিপ উন্নয়ন করা হবে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সমূহে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র কৃতিত্ব ও সফলতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ও ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প নির্বাচন করে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুবিধা বৃদ্ধি, পাবসস অফিস নির্মাণ যদি নির্মিত না হয়ে থাকে এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা (এগ্রোবিজনেস) উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ছাড়া ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে গুদাম তৈরি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ যেমন রাস্তা ও মার্কেট উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। এই সমস্ত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ১ লাখ ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে। নিষ্কাশনের উন্নতি এবং অধিক পানি সংরক্ষণের জন্য ভরাট খাল পুনঃখননে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলে এই প্রকল্প পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নারীদের অংশগ্রহণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যভূক্তিতে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যাতে করে সকল কার্যক্রমে নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী থাকে। উপ-প্রকল্প নির্মাণে মাটির কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) নিয়োজিত হয়। এলসিএস এর সদস্যভুক্ত হয়ে নারীরা উপ-প্রকল্প নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং কর্মসংসংস্থানের সুযোগ ও পারিবারিক আয় বর্ধনের লক্ষ্যে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় টেকসই মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাছ চাষের উপরে প্রশিক্ষণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নারী সদস্যদের জন্য সুযোগ রাখা হয়েছে।

অধিবেশন - ১

উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম

উপ-প্রকল্পের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৭ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই প্রকল্প কার্যক্রমের মূল উদ্দ্যেশ্য হলো টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের মোট ২৯ জেলায় নতুন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প, ইতোপূর্বে নির্মিত উপ-প্রকল্পে অতিরিক্ত উন্নয়ন ও মডেল হিসেবে ফ্লাগশিপ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে উপ-প্রকল্পে খাল খনন বা পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ বা সংস্কারে সর্বাধিক ১,০০০ হেক্টর উপকৃত এলাকায় কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে খাল খনন বা পুনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ, সেচ নালা নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়। উপ-প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানে নির্মিত অবকাঠামোর কার্যকারিতা সাপেক্ষে উপ-প্রকল্পের ধরণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় চার ধরণের উপ-প্রকল্পে নির্মিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

উপ-প্রকল্পের ধরণ	অবকাঠামো	উদ্দেশ্য
(১) বন্যা ব্যবস্থাপনা Flood Management (FM)	বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন। রেগুলেটর বা স্লুইস। খাল খনন বা পুনঃখনন। কালভার্ট, ইত্যাদি।	বন্যা প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা। সময়মত ফসল বপন বা রোপণ ও কর্তন। বন্যা থেকে ফসল রক্ষা। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মাছ চাষ। বাঁধের পার্শ্বে বৃক্ষ উৎপাদন।
(২) পানি-নিষ্কাশন Drainage(DR)	খাল খনন বা পুনঃখনন। স্লুইস, ইত্যাদি।	সময়মত বন্যাপানি নিষ্কাশন। জলাবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা। খালে পানি সংরক্ষণ। সময়মত ফসল বপন বা রোপণ ও কর্তন। মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা। মাছ চাষ। বাঁধের পার্শ্বে বা খাল পাড়ে বৃক্ষ উৎপাদন।
(৩) পানি সংরক্ষণ Water Conservation (WC)	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুন:খনন, কালভার্ট, ইত্যাদি।	খাল ও নদী পানি সংরক্ষণ। মাটির আর্দ্রতা ও সেচ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি সেচ এলাকা প্রসার। অতিরিক্ত সেচ সুবিধা। মাছ চাষ। খাল পাড়ে বৃক্ষ উৎপাদন।
(৪) কমান্ড এলাকা উন্নয়ন Command Area Development (CAD)	সেচ নালা সংস্কার, ভূপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট, সাইফুন, ইত্যাদি।	খাল ও নদীর পানি সেচ। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সময়মত ও চাহিদা অনুযায়ী পানি সেচ। সেচ পানির অপচয় রোধ। সেচ এলাকা বৃদ্ধি। বন সম্পদ উন্নয়ন।

উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের উপ-প্রকল্পের ধরণ, বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করতে হবে। উপ-প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সরবরাহের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি, উপ-প্রকল্প উপযোগী কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম প্রণয়ন, দীর্ঘপোযোগী পরিবেশ অনুকূল চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ, কৃষকদের উদ্বুদ্ধ হতে এবং কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজনে এই পর্যালোচনা সহায়ক হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম ঃ

এই সমিতির প্রদান কার্যক্রম হলো উপ-প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের চাহিদা ও ডিজাইন মোতাবেক উপ-প্রকল্পের নির্মাণ সময়মত সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, সদস্যভুক্তিকরণ লক্ষ্য পূরণ, সদস্যদের শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতরি নিজস্ব তহবিল বর্ধন, ম্যানেজার/হিসাবরক্ষকের কার্যক্রম অব্যহত রাখার ব্যবস্থা, সমিতির রেজিষ্টারসমূহ এবং রেকর্ডপত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঝুলে থাকা কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি সাধন,পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবক্ষণ, উন্নত কৃষি উৎপাদন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্রতা হ্রাস কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিবীক্ষণ, এলজিইডি, ইউনিয়র পরিষদ এবং সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ ও মহিলা অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা, দরিদ্র সদস্যদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অর্থ যোগান, ক্ষুদ্রচাষী ও ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পাবসস তহবিল অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ. উপ-প্রকল্পে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, প্রথম বছর যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমাপ্তির পর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানা গ্রহণ ও পাবসস।

উপ-কমিটি গঠন ঃ

সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা, বাস্তবায়ন, তদারক ও পরিবীক্ষণে প্রয়োজন মত উপ-কমিটি গঠিত হবে যেমন, (১) নির্মাণ পরিবীক্ষণ উপ-কমিটি, (২) পরিচালনা ও রক্ষণাবক্ষণ (ওএন্ডএম) উপ-কমিটি, (৩) কৃষি উপ-কমিটি, (৪) কৃষি ব্যবসা ও বিপনন উপ-কমিটি (৫) মৎস্য ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, (৬) ক্ষুদ্র ঋণ উপ-কমিটি, (৭) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, (৮) নারী উন্নয়ন উপ-কমিটি (৯) দারিদ্রতা বিমোচন উপ-কমিটি।

সদস্য ও উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন ঃ

উপপ্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের দক্ষ পরিচালনা ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সাধারণ সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য এবং উপকারভোগীদের স্বস্ব পেশায় ও দায়িত্ব পালনে পারদর্শীতা অর্জনে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং প্রশিক্ষন লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন, সমবায় ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ পরীবিক্ষণ এবং নির্মিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, টেকসই কৃষি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ও সঠিক উপকরণ প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন, গবাদিপশু পালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থান, ও দারিদ্র্য বিমোচন।

অধিবেশন - ২

মাছ চাষে নারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, মাছ চাষে নারী, মাছ চাষে নারীদের বাড়তি আয়, সংসারে নারীর অধিকার ও ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং পুষ্টি সমস্যা সমাধানে নারীর ভূমিকা

উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে যথাযথ অবদান রেখে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদানে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন অত্যান্ত অপরিহার্য্য। এ লক্ষে উপ-প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগী নারীদের মাছ চাষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ আছে। নারীরা বসতবাড়ির পার্শ্বের পুকুরে কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করতে পারে। পুরুষেরা বাড়ির বাহিরে কাজে যায় তারা অনেক সময় পুকুরে মাছ চাষের দিকে ততটা খেয়াল করতে পারে না, অপরদিকে নারীর বেশীরভাগ সময় বাড়িতে থাকে এবং নারীদের যদি এ বিষয়ে প্রযুক্তিগত ধারণা দেয়া যায় তাহলে বাড়ির পার্শ্বের পুকুরটাতে নারীগন বেশি কার্যকরভাবে দেখভাল করতে পারে। মাছ চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে, নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুকুর পরিস্কার, পুকুর প্রস্তুত, চুন দেয়া,সার দেয়া,পোনা নির্বাচন করতে পারে। পরিবারের চাহিদা বিবেচনা করে পুকুর হতে মাছের আংশিক আহরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মাছ চাষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ নিতে পারে, মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। অর্থ উপাজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে নারীরা আত্মনির্ভশীল ও স্বাবলম্বী হয়, তারা পারিবারিক ও উৎপাদনমূলক কাজ যেমন- বিভিন্ন প্রযুক্তিতে মাছ চাষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে পারিবারের সঞ্চয় বাড়ে। স্বভাবজাত কারনেই নারী তার উপার্জিত ও সঞ্চিত অর্থ সন্তানদের লেখাপড়া,ঘরবাড়ির উন্নয়ন , চিকিৎসা, সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যয় করে। তার সার্বিক জীবন মানের উন্নয়ন হয়। পুরুষের তুলনায় মাছ চাষে নারীরা বেশী সম্পৃক্ত থাকলে পরিবারের মাছ খাওয়ার পরিমান বাড়ে। একজন নারী যখন মাছ চাষের মাধ্যমে অর্থ উপাজন করে, মাছ চাষ সংক্রান্ত কাজে পুরুষকে সহায়তা করে, তখন পরিবারের সকল সদস্যের তার প্রতি দৃষ্টিভংগি ও মনোভাবের পরিবর্তন হয়।। সে সহজেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন আনতে পারে।সম্পদ ব্যবহারের অধিকার অর্জন করে, চলাচলের স্বাধীনতা পায়। মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিতে বাড়ির বাইরে যেতে পারে। মাছ চাষের উপকরণ ক্রয় করতে বাজারে যেতে পারে। যখন নারী আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয় পরিবারের সাথে সাথে সমাজও তাকে মুল্যায়ন করে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন কাজে তাকে আমন্ত্রন জানানো হয়। এভাবে তার নেতৃত্বদানের সক্ষমতা অর্জিত হয়। প্রশিক্ষন পেয়ে নারীরা পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গুনগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়েও ভূমিকা রাখতে পারে। বাড়ির পার্শ্বের একটুকরো জমিতে চৌব্বাচ্চা বানিয়ে সেখানে নারীরা বায়োফ্লক পদ্ধতি অনুসরনে তেলাপিয়া অথবা ভিয়েতনামী প্রজাতির কৈ মাছের চাষ করে তারা সংসারে মাছের যোগান দিতে পারে এবং বিক্রি করে বাড়তি অর্থও আয় করতে পারে। নারীরা পাবসস এর খালের পানিতে ছোট ছোট ভাসমান খাচায় তেলাপিয়া কিংবা ভিয়েতনামী প্রজাতির কৈ মাছের চাষ করতে পারে। সেখানে তিন মাস অন্তর মাছ ধরে সংসারে মাছের যোগান দিতে পারে এবং বিক্রি করে বাড়তি অর্থও আয় করতে পারে। খালের পানিতে বাক্স সেট করে কুচিয়ার চাষ করেও তারা বাড়তি অর্থ আয় করতে পারে। প্লাবনভূমির জলাশয়ে পেনকালচার পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে তারা অর্থ আয় করতে পারে। এ সকল কাজে সাহস ও উৎসাহ দিতে পারে এর উপরে প্রায়োগিক নারীবান্ধব প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির সহায়তা। মূলতঃ উপরোক্ত বিষয় সমূহে নারীর অংশগ্রহনের সাহস এবং উৎসাহ সৃষ্টির জন্য এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

মাছ চাষে নারীর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের ছবি

মলা মাছ

বাংলাদেশে মোট ৪ কোটীর মত নারী অপুষ্টির স্বীকার। শতকরা ৩১ ভাগ কিশোরীরা (১৫-১৯ বছর বয়সী) অপুষ্টির স্বীকার। শতকরা ৪০ ভাগ শিশু (৫ বছরের নীচে) অপুষ্টির স্বীকার। শতকরা ৩৯.৯ ভাগ মায়েরা রক্তশুন্যতায় ভোগেন। অপরদিকে এখন দেশের মাছের উৎপাদন এবং ভক্ষণ অনুযায়ী প্রতিদিন প্রতিজনে ৬৩ গ্রাম মাছ খাওয়া হয়। প্রশ্ন জাগে এক্ষেত্রে নারীর অপুষ্টির এ চিত্র কেন । এর কারন হিসেবে দেখা যায় একদিকে গ্রামীন নারীর পুষ্টি সম্মন্ধে সম্যক ধারনার অভাব অপরদিকে নারীর প্লেটে পরিমানমত মাছের যোগানের অভাব। এজন্য মাছ ও এর পুষ্টি সম্মন্ধেও নারীর সম্যক ধারনা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামীন ছোট পুকুরে কিংবা মৌসুমীয় জলাশয়ে যে মলা, ঢেলা,ডারকিনা ও অন্যান্য ছোট মাছ পাওয়া যায় তাতে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াস, ম্যংগানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন এ, ডি পাওয়া যায়। নারীর শরীরে পুষ্টি চাহিদা পূরণে এবং দুধদানকারী মায়েদের জন্য এ সকল পুষ্টি অপরিহার্য। ছোট মাছ আমিষ, এসেন্সিয়াল ফ্যাটি এ্যাসিড, ভিটামিন এবং সিনারেলস এ ভরপুর। যেহেতু ছোট মাছ মাথা, পেট, কাটা শুদ্ধ খেয়ে ফেলা হয় সেহেতু এ মাছ জৈব সম্মৃদ্ধ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ ,আয়রন এবং জিঙ্ক মানুষের শরীরে ভাল কাজে লাহেজ। সকল প্রকারের মাছের মাংশেই রয়েছে প্রানিজ আমিষ। যা সচরাচর শতকরা ২৮ থেকে ৩৮ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন অপ্রচলিত মাছে (যেমন লোইট্টা মাছ) প্রানিজ আমিষের পরিমান শতকরা ৫৮ থেকে ৬০ পর্যন্ত হয়ে থাকে । তেলাপিয়া, রুই, কাতলা এ সকল কার্প জাতীয় মাছে প্রানিজ আমিষের পরিমান শতকরা ২৮ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার চিংড়ি এবং শিং মাছে এ আমিষের পরিমান শতকরা ৩৮ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সামুদ্রিক মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা আমাদের মানুষের হার্টের জন্য উপকারী।

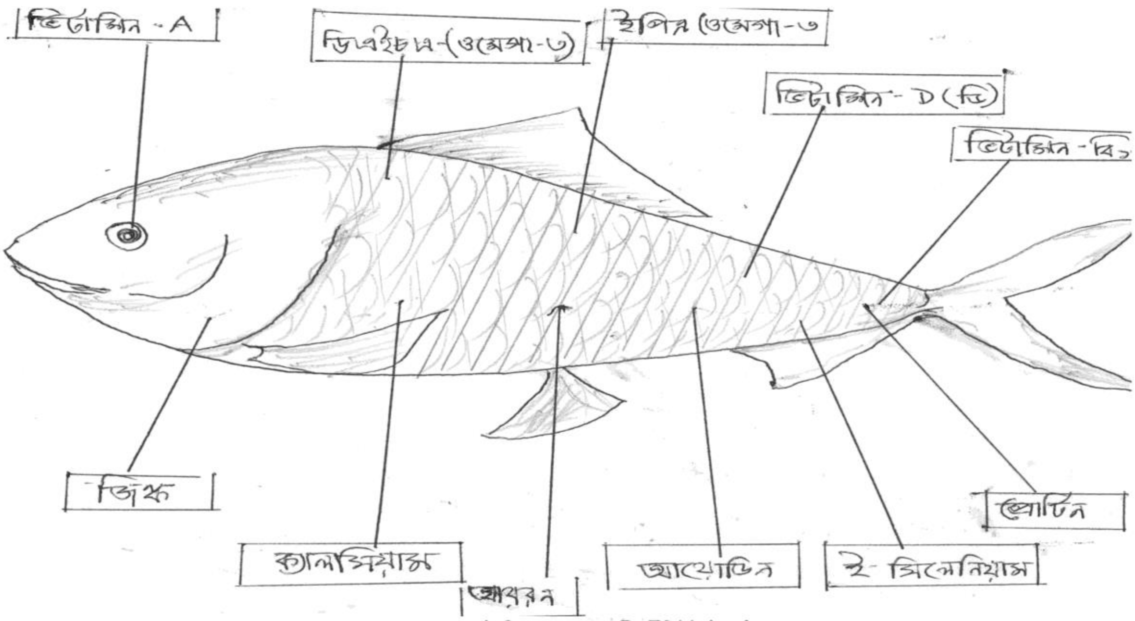

মাছ : প্রকৃতির সেরা খাদ্য

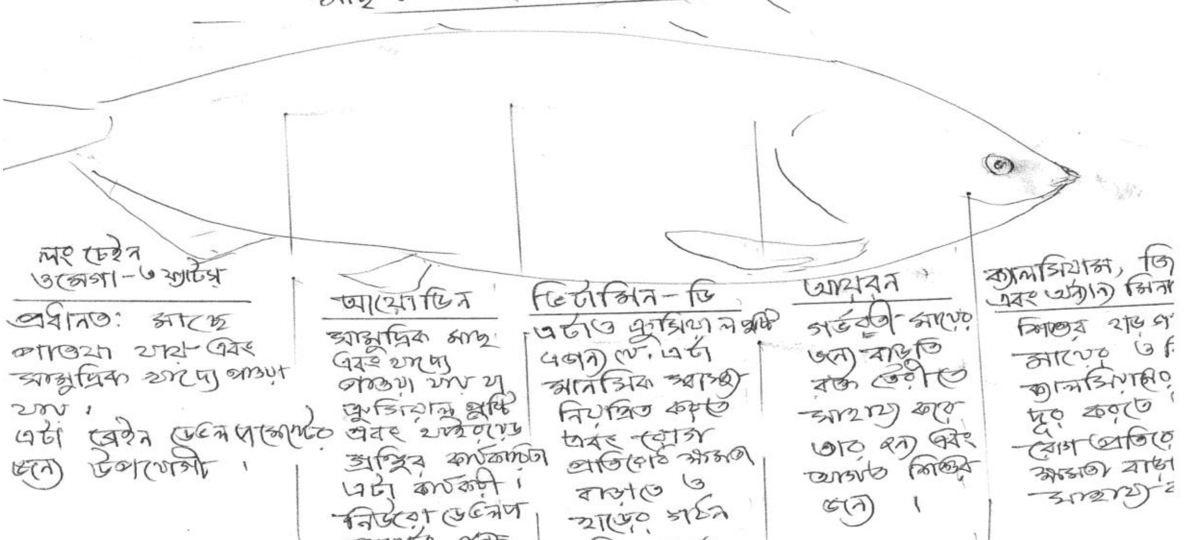

মাছের বিভিন্ন পুষ্টির কার্যকারিতা

অধিবেশন - ৩

বাড়ীর আঙ্গিনার পুকুরে মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহন- কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, মৌসুমী পুকুরে থাই কৈ / ভিয়েতনামী কৈ এবং জিওল মাছ একত্রে, থাই সরপুটি ও তেলাপিয়া মাছের চাষ

৩.১: কার্প (রুই) জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ঃ

পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলি সম্পন্ন করতে হয়।

পুকুরে মাছ চাষে কৃষির মতই পুকুর প্রস্তুতি আবশ্যকীয় কার্যক্রম যা করতেই হয়।

ক . পুকুর প্রস্তুতি ঃ

ক.১: পুকুরের পাড় মেরামত।

ক.২: পুকুরের তলার কাদা অপসারন।

ক.৩: আগাছা পরিস্কার এবং পাড়ের পাশের গাছপালার ডাল অপসারন।

ক.৪: রাক্ষুসে মাছ বা আমাছা নিয়ন্ত্রণ।

পুকুরে পানি থাকা অবস্থায় প্রস্তুতের জন্য রাক্ষুসে মাছ পরিস্কার করার জন্য রোটেনন ঔষধ ব্যবহার।

ক.১: পাড় মেরামত ঃ পুকুরের পাড় যদি ভাঙ্গা থাকে এবং বর্ষাকালে পুকুরের পানি বাইরে এবং বাইরের পানি পুকুরে আসতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে পুকুরের চাষের মাছ যেমন বাইরে যেতে পারে তেমনি বাইরের রাক্ষুসে মাছ ও অনাকাক্ষিত মাছ (আমাছা) বাইরে আসতে পারে কিংবা রোগ বালাই আসতে পারে যার কোনটাই ভাল নয়। সেজন্য মাছের পোনা মজুদের পাড় মেরামত করতে হবে।

ক.২: পুকুরের তলার কাদা অপসারন ঃ পুকুর প্রস্তুতির অন্যতম একটি কাজ পুকুরের তলার কাদা মাছ চাষের শুরুতেই কমপক্ষে ১ ফুট বা কোদাল পরিমান তুলে ফেলা।তলার কাদায় সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড (co_2), কার্বন মনোক্সাইড (co), মিথেন (CH4), অ্যামোনিয়া (NH3), হাইড্রোজেন সালফাইড(H2S) ইত্যাদি অনাকাক্ষিত গ্যাস থাকে। কাদা উঠিয়ে পাড় মেরামত করা যায় এবং পুকুর কয়েকদিন (৭ দিন) রৌদ্রে শুকিয়ে নিলে ভালো হয়।

ক.৩: আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ পুকুরের পানির উপরের কিংবা পাড়ের কিংবা বাইরের বড় গাছের ডালপালা, পাতা পরিস্কার করে পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো তাপ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পানির উপরের আগাছা (কচুরীপানা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা, আড়ালি ইত্যাদি) পানির পুষ্টি টেনে নেয়। যা মাছের জন্য খাদ্য তৈরীতে কাজে লাগতো তা এই আগাছা শুষে নেয়। ফলে পুকুরে মাছের খাদ্য তৈরীতে বিঘ্ন সৃস্টি হয়। এজন্য এগুলো পরিস্কার করতে হবে। অন্যদিকে পাড়ের কলাগাছের পাতা, চড়কা গাছ অথবা অন্য কোন বড় গাছের ডাল পানিতে ছায়ার সৃষ্টি করলে তা অপসারন করতে হবে।এসকল ডালপালা, পাতায় পানিতে ছায়ার সৃষ্টি করে। ফলে পানিতে মাছের খাদ্য তৈরীর অন্যতম উপাদান সূর্যের আলোর অভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এবং পানিতে মাছের জন্য কম খাদ্য তৈরী হয়।

ক্লোরোফিল + সূর্যের আলো + কার্বন ডাই অক্সাইড (Co2) + পানি (H2O) = কার্বোহাইড্রেট(শর্করা) (C6H12O6) + অক্সিজেন (O2)

কাদা অপসারনের ৭ দিন পর চুন দিতে হয়।

ক.৪ : রাক্ষুসে মাছ বা আমাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ রাক্ষুসে মাছ (টাকি, বেলে, শোল ইত্যাদি) এবং আমাছা (চাঁদা, ডানকোনা, মায়া, পুটি ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রনের জন্য রোটেনন পাউডার ব্যবহার করা উচিৎ। বাজারে প্রাপ্ত রোটেনন যাতে বাতাস লাগে নাই এমন রোটেনন যা ৯ মাত্রার উহা শতক প্রতি ১ ফুট পানিতে ৩০-৩৫ গ্রাম হারে ব্যবহার করা উচিৎ। (১০ শতকের পুকুরের গড় ৫ ফুট পানি থাকলে ১০*৫*৩৫=১৭৫০ গ্রাম রোটেনন পাউডার লাগবে।) মোট পাউডারকে দুই ভাগ করে অল্প পানি দিয়ে আঠারমত খামির করে গুলি গুলি করে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে।বাকি অর্ধেক ১৫ মিনিট পর বালতিতে বা হাড়িতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। রোটেনন দেয়ার আধাঘণ্টা পর মাছ মরলে জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নেয়া যায়। আবহাওয়ায় বাতাস যখন নিথর থাকে, রৌদ্রের সময় রোটেনন দিতে হবে। রোটেননে অমেরুদণ্ডী চিংড়ী মরবে না। বাজে চিংড়ি মারতে হলে রোটেননের সংগে শতক প্রতি ১ ফুট পানির গভীরতায় ১ মিলিমিটার করে সুমিথিয়ন গুলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

রোটেনন ঃ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর রোটেনন বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। প্যাকেট করা রোটেনন পাউডার যা বাতাসের সংস্পর্শ লাগে নাই এমন পাউডার পরিমাণমত কিনে পুকুর পাড়ে এনে দুই ভাগ করতে হবে। এক ভাগে কিছু পানি মিশিয়ে খামির করে গুলি গুলি আকার করে সমস্ত পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর বাকী রোটেনন পাউডার গুলি বালতিতে গুলে পুকুরে সমস্ত পানিতে সমানভাবে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে।

শতক প্রতি রোটেনন ব্যবহারের মাত্রা	১০০ শতকের পুকুরে ৫ ফুট পানি থাকলে	১/২ ঘণ্টা পর
শতকরা প্রতি/৩৫ গ্রাম/১ ফুট	১৭.৫০ কেজি	জাল টেনে মাছ ধরতে হবে।
পানির জন্য		

পানিতে নাড়াচাড়া কম দিতে হবে। বাতাস নিথর থাকা অবস্থায় এই পাউডার ছড়ানো ভাল। বৃষ্টির ভেতর এই পাউডার না দেওয়া ভাল। মাছ মরা শুরু হলে জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নিতে হবে। রোটেনন পাউডার দিয়ে মারা মাছ খাওয়া যাবে।

(খ) চুন দেয়া ঃ পুকুর প্রস্তুতির এই ধাপে পাথুরে চুন গুলিয়ে শতক প্রতি ১ কেজি তলায় এবং পাড়ে ছড়িয়ে দিতে হয়।এতে তলার অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাস নিয়ন্ত্রন, রোগ বালাই দমন, মাটি ও পানির পি এইচ নিয়ন্ত্রন হয়। মাছের জন্য পুকুরের পানিতে মাছের খাদ্য তৈরী হয়। তলার কাদা মাটিতে চুন দিয়ে ১ দিন পর কমপক্ষে৩-৪ ফুট পানি দিয়ে পুকুর ভরে দিতে হয়।

(গ) সার দেয়া ঃ চুন দেয়ার ৩(তিন) দিন পরে পুকুরে জৈব ও অজৈব সার দিতে হয়।শতক প্রতি জেব ও অজৈব সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল।

সারের নাম	**সারের পরিমাণ**
গোবর সার	৫-৭ কেজি
ইউরিয়া	১৫০-২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম
এম ও পি	৩৫-৪০ গ্রাম

তবে সার ছড়ানোর সময় ইউরিয়া সার মেশানো ভাল। গোবর সার ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে দেয়া ভাল। জৈব ও অজৈব সার একত্রে ভিজিয়ে পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(ঘ) মাছের পোনা মজুদ ঃ

সার দেয়ার ৩ (তিন) পর পুকুরে মাছের পোনা মজুদ করতে হয়। সেক্ষেত্রে রুই জাতীয় মাছের চাষে এক বছর বয়সী ৪”-৫” ইঞ্চি আকারের পোনা মাছ মজুদ করা ভাল। নিম্নে সরণী অনুসরন করে পোনা মজুদ করা যায়।

সরনী-১ ঃ রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ঃ

পোনার প্রজাতির নাম	পোনার বয়স	পোনার আকার	পোনার স্বাস্থ্য	পোনার সংখ্যা(শতক প্রতি)
কাতলা	১ বছর	৪"-৫"	সুঠাম দেহ চঞ্চল এবংস্বচ্ছ,আইস না ছাড়ানো	১৫
সিলভার কার্প	"	৪"-৫"	"	১০
রুই	"	৪"-৫"	"	২৫
গ্রাস কার্প	"	৫"-৬"	"	৫
মৃগেল	"	৪"-৫"	"	২০
কালিবাউস	"	৪"-৫"	"	৫
ব্লাক কার্প	"	৫"-৬"	"	১

(ঙ) পোনার পরিচর্যা ঃ

ঙ.১: মাছের খাদ্য দেয়া ঃ

মাছের পোনা মজুদের পর পোনা মাছকে দৈনিক খাবার দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মাছের শরীরের মোট ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ করে খাবার দিতে হয়। অর্থাৎ ১০০ কেজি মাছ থাকলে প্রতিদিন ঐ ১০০ কেজি মাছের জন্য ২-৩ কেজি সম্পূরক খাদ্য দিতে হয়।মাছের খাদ্য হল সরিষার খৈল, চালের কুড়া, গমের কুড়া, ভূট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন খৈল এবং মাছের চূর্ন বা ফিস মিল। এসকল খাবার একত্র করে রুই জাতীয় মাছকে খাওয়ানো যায়। সেক্ষেত্রে পাউডার অবস্থায় ভিজিয়ে অথবা দানাদার অবস্থায় দেয়া যায়। যে ভাবেই দেয়া হোক না কেন দেখার বিষয় হোল বানানো মিশ্র খাদ্যে যেন আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ হয়। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানীর বানানো দানাদার খাবার বস্তায় পাওয়া যায়। যাতে আমিষের পরিমাণ বস্তার গায়ে লেখা আছে। ২৮% আমিষের এক্ষেত্রে এসিআই মেগাফিড, কোয়ালিটি ফিড এর দানাদার খাবার অন্যতম। পোনা মজুদের পর শতকরা ৩ ভাগ হারে খাবার দিতে শুরু করে শতকরা ২ ভাগ হারে শেষ করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, প্রতি সপ্তাহ অন্তরে ঐ হিসাবে মোট খাবারের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। মাছের ওজন বাড়ার সাথে সাথে খাবারের মোট পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু শতকরা হার উপরের বর্ণনানুসারে ঠিক থাকবে।

সরণী-২ ঃ

সপ্তাহ	পোনা মাছের ওজন	পোনা মাছের প্রতিটির জন	দেয় খাদ্যের পরিমাণ	অন্যান্য
১ম	১০০ কেজি	২৫.০০ গ্রাম	৩(কেজি)	প্রতিদিন২বারে খাওয়াতে হবে
২য়	১২০ কেজি	৩০.০০ গ্রাম	৩.৬ কেজি	
৩য়	১৪৪ কেজি	৩৬.০০ গ্রাম	৪.৩২ কেজি	
৪র্থ	১৬৪ কেজি	৪১.০০ গ্রাম	৪.৯২ কেজি	
৫ম	১৮৪ কেজি	৪৬.০০ গ্রাম	৫.৫২ কেজি	
৬ষ্ট	২১৪ কেজি	৫৩.৫০ গ্রাম	৬.৪২ কেজি	

সরণী-৩ ঃ

৬.২ সার দেয়া ঃ পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় প্রতিদিন জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার

সারের নাম	১০০ শতক প্রতি দৈনিক পুকুরে ১ বার দেয় সারের পরিমাণ	অন্যান্য
গোবর	৫-৭ কেজি	গোবর সার ২ দিন ভিজিয়ে দিতে হবে । এই সঙ্গে টিএসপি ভিজিয়ে দেয়া যায়। ইউরিয়া এবং এম ও পি ছড়িয়ে দেয়ার সময় মিশিয়ে দিলেই হয়।একত্রে মিশিয়ে পুকুরের পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে।
ইউরিয়া	১৫০-২০০ গ্রাম	
টিএসপি	৭৫-১০০ গ্রাম	
এম ও পি	৩৫-৪০ গ্রাম	

দৈনিক সার দিতে দিতে পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ হয়ে গেলে এবং পুকুরের তলায় ও পানিতে গ্যাস লক্ষ্য করা গেলে সার দেয়া ২-৩ দিনের জন্য বন্ধ রাখা ভাল। তখন তলায় হররা অথবা জাল টেনে দেয়া ভাল। সার দেয়ার ৩ দিন পর জাল টেনে মাছের পোনা ছাড়তে হবে। কোন কারণে যদি সন্দেহ হয় পুকুরের পানিতে বিষাক্ততা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ৩ দিন পর কিছু পোনা ছেড়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে যে, পোনা মরে কিনা। এদেরকে পরীক্ষার(এঃবংঃ-এর পোনা) পোনা মাছ বলা হয়। বিষাক্ততার প্রমাণ না পাওয়া গেলে সমস্ত পোনা মাছ ছেড়ে দিতে হবে।

প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ঃ

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ কাজটি কয়েকটি পদ্ধতিতে করা যায়, যেমন-হাত দিয়ে পরীক্ষা ।পুকুরের পানিতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে হাত কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখতে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে। আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রয়োজনীয় খাবার নেই।

সেক্কী ডিক্স দিয়ে পরীক্ষা ঃ

সেক্কী ডিক্স হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রংয়ের গোলাকার চাকতি যার ব্যাস ২০ সেঃ মিঃ। চাকতিটি সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। হাত দিয়ে সুতা ধরে সেক্কি ডিক্স পানিতে ডুবানোর পর যে গভীরতা পর্যন্ত চাকতিটি দেখা যায় তদানুসারে উর্বরতা নির্ণয় করা যায়। যদি ২৫-৩৫ সেঃ মিঃ গভীরতায় দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে ভাল খাবার আছে। ৩৫ সেঃ মিঃ এর বেশী গভীরতায় সেক্কি ডিক্স দেখা গেলে বুঝতে হবে খাবার অত্যন্ত কম। তখন আরো সার দিতে হবে। সূর্যের আলোকিত দিনের বেলা **১১-১** টার মধ্যে সেক্কি ডিক্স বা হাত দিয়ে খাবার পরীক্ষা করুন। কখনো ঘোলা পানিতে পরীক্ষা করবেন না।

ঙ.৩ ঃ জাল টানা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ঃ

পোনা ছাড়ার ১ মাস পর জাল টেনে মাছ ধরে দেখতে হবে মাছের কাঙ্ক্ষিত দেহবৃদ্ধি হচ্ছে কিনা। প্রতিটি পোনা মাছ প্রতিদিন ২ গ্রাম হারে বাড়ছে কিনা। যদি বাড়ে এবং কোন রোগবালাই না থাকে তাহলে পানি মেরে নাল কাটিয়ে মাছ ছেড়ে দিতে হবে। যদি রোগবালাই লক্ষ্য করা যায় তাহলে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাকে দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

ঙ.৪ ঃ চুন দেয়া ঃ

১ মাস পর জাল টানার দিন চুন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পূর্ব হতেই পরিমাণমত চুন এনে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জাল টানার ২-৩ ঘন্টা পূর্বে চুন ভিজিয়ে দিতে হবে। চুন ঠাণ্ডা হলে পুকুরের পানিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিম্নে সরণী অনুযায়ী পুকুরে মাছ থাকা/চাষ অবস্থায় চুন দিতে হবে।

সরণী-৩ ঃ

পানির গড় গভীরতা(ফুট)	শতক প্রতি চুনের পরিমাণ (কেজি)	অন্যান্য
৫ ফুটের উপরে	১ কেজি	সম্ভব হলে মেশিন দিয়ে পি. এইচ পরীক্ষা করা ভাল
৫ ফুট পর্যন্ত	৫০০গ্রাম	
৪ ফুট পর্যন্ত	৩০০গ্রাম	
৩ ফুট পর্যন্ত	২০০গ্রাম	

ঙ.৫ ঃ পানির প্রবাহ ঃ

পুকুরে মাছ চাষ অবস্থায় পানিতে গ্যাস হলে বা মাছ অস্বাভাবিকভাবে মাছ ভেসে উঠছে লক্ষ্য করলে পুকুরের পানিতে পানির প্রবাহ দিতে হবে। প্রয়োজনে বাহির হতে নতুন/পরিস্কার পানি যোগ করতে হবে।

(চ) মাছ আহরণ, বিপনন ও নতুন করে মজুদ ঃ

পোনা মাছ মজুদের ৬ মাস পর বাজার আকৃতির হলে জাল টেনে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজারের সমসাময়িক মূল্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সরণী-৪ দ্রষ্টব্য ঃ

মাছের প্রজাতি(নাম)	**বিক্রয় উপযোগী প্রতিটা মাছের ওজন**
কাতলা	১ কেজির উপর
সিলভার কার্প	১ কেজির উপর
রুই	১/২ কেজির উপর
গ্রাস কার্প	১ ১/২ কেজির উপর
মৃগেল	১/২ কেজির উপর
কালিবাউস	১/২ কেজির উপর
ব্লাক কার্প	২ কেজির উপর

প্রথমবার মাছ আহরণ ও বিপণনের পরে সংখ্যায় যতটা যে প্রজাতির মাছ বিক্রয় করা হল ঐ প্রজাতির পোনা মাছ ১০% বাড়ানো সংখ্যায় আবার মজুদ করতে হবে।বছর শেষে অথবা চাষ মৌসুম শেষে অথবা পুকুর নতুন করে প্রস্তুতি করার আগে সমস্ত মাছ উঠিয়ে বিক্রি করে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে পানি কমিয়ে বার বার জাল টেনে সমস্ত মাছ ধরে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সবশেষে রোটেনন বিষ দিয়ে মাছ উঠিয়ে নিতে হবে।

৩.১.১ : রুই জাতীয় মাছ চাষে আয় ও ব্যয় ঃ

এক একর (১০০ শতক) জলাশয়ে মাছের চাষ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	মাছের প্রজাতির নাম	শতক প্রতি পোনা প্রজাতির সংখ্যা	১০০ শতকে পোনা প্রজাতির সংখ্যা	৮ মাসে পোনার ওজন	মোট ওজন কেজি)	প্রতি কেজি মাছের বাজার মূল্য	প্রতি কেজি মাছের উৎপাদনে খাদ্যেও পরিমাণ (কেজি)	মোট খাদ্য কেজি	মোট খাদ্যের মূল্য	মোট মাছের মূল্য
১	কাতলা	১৫	১৫০০	১৫০০ কেজি (১কেজি হারে)	১৫০০	১৫০.০০	২ কেজি @৩০.০০	৩০০০		
২	সিলভার কার্প	১০	১০০০	৮৫০ কেজি(৮৫০গ্রাম হারে)	৮৫০	১০০.০০	”	১৭০০		
৩	রুই	২৫	২৫০০	১২৫০ কেজি (৫০০গ্রাম হারে)	১২৫০	১২৫.০০	”	২৫০০		
৪	গ্রাস কার্প	৫	৫০০	৭৫০ কেজি(১.৫ কেজি হারে)	৭৫০	১০০.০০	”	১৫০০		
৫	মৃগেল	২০	২০০০	১০০০ কেজি (৫০০গ্রাম হারে)	১০০০	১০০.০০	”	২০০০		
৬	কালিবাউস	৫	৫০০	২৫০ কেজি(৫০০ গ্রাম হারে)	২৫০	১২৫.০০	”	৫০০		
৭	ব্লাক কার্প	১	১০০	১৫০ কেজি(১.৫ কেজি হারে)	১৫০	১৫০.০০	”	৩০০		
৮	মোট	৮১	৮১০০	৫৭৫০ কেজি	৫৭৫০ কেজি	৮৫০ টাকা		১১৫০০ কেজি	৩,৪৫,০০০	৬,৯৫,০০০

প্রতি কেজি মাছের গড় মূল্য ১২০.০০ টাকা

লেবার, সার এবং অন্যান্য ব্যয় = ৩৫,০০০.০০ টাকা

মাছ উৎপাদনে ব্যয় = ৩,৪৫,০০০.০০টাকা

মোট = ৩,৮০,০০০.০০ টাকা

মোট আয় (মাছ বিক্রয় হতে) = ৬,৯৫,০০০.০০ টাকা

ব্যয় ও আয়ের অনুপাত = ১ঃ১.৮২

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

১. যেহেতু মাছের বড় আকারের পোনা মজুদ করা হয়েছে উন্নত সনাতন পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে সেইহেতু মাছের মৃত্যুহার বিবেচনায় নেয়া হয় নাই।

২. গ্রাস কার্পের জন্য কলার পাতা, ঘাস ও ধানের বিছালী খাওয়ালে গ্রাস কার্প যেমন দ্রুত বড় হবে অন্যান্য মাছের খাবারের পর্যাপ্ততা বাড়বে এবং সে সকল মাছও দ্রুত বড় হবে।

৩. ১৫ দিন অন্তর শতক প্রতি ৫ ফুটের উপর পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে এবং ৪ ফুট পানিতে ৩০০ গ্রাম হারে চুন দিতে হবে।

৪. আয়োডিন, থায়োনিল, ফসটসিন ঔষধ দিয়ে পুকুরের রাক্ষুসে মাছ মেরে পুকুর প্রস্তুত করলে এই ফলন হবে না।

৩.২ : থাই কৈ/ ভিয়েতনামী কৈ এবং জিওল (শিং)মাছের চাষ ঃ

ক. কৈ মাছের চাষ ঃ

সার দেয়ার ৩-৪ দিন পর পুকুরে কৈ মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পূর্ব হতেই পোনার ব্যাপারে যোগাযোগ করে চুক্তি করে রাখতে হবে। ন্যুনতম ১"-১.৫" আকারের পোনা যা ১৬০-১৬৫ টায় কেজি হবে তা মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে থাই কৈ কিংবা ভিয়েতনামের কৈ ভ্যারাইটি যেটাই হোক না কেন এর থেকে ছোট আকারের পোনা মজুদ করলে মাছের টেকসই হার কম হবে। কৈ মাছের সাথে সহযোগী মাছের চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশী জিওল মাছের পোনা, কাতলা এবং সিলভার কার্প মাছের পোনা মজুদেও নিম্নের সরণী অনুসরণ করা যেতে পারে।

১ শতক জলাশয় ঃ

পোনার প্রজাতির নাম	পোনার ন্যুনতম বয়স	পোনার আকার	পোনার সংখ্যা (শতক প্রতি)	পোনার স্বাস্থ্য
থাইকৈ/ভিয়েতনামের কৈ	এক (১) মাসের উপর বয়স	১"-১.৫"	৬০০টি	সুঠামদেহ, স্বচ্ছ, সুস্থ, সবল
জিওল মাছের পোনা	এক (১) মাসের উপর বয়স	২"২.৫"	১০০টি	"
কাতলা	মাসের উপর বয়স	৪"-৫"	১০টি	"
সিলভার কার্প	"	৪"৫"	১০টি	"

খ. থাই সরপুটির চাষ ঃ

সার দেয়ার ৩-৪ দিন পর পুকুরে কৈ মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পূর্ব হতেই পোনার ব্যাপারে যোগাযোগ করে চুক্তি করে রাখতে হবে। ন্যুনতম ১"-১.৫" আকারের পোনা যা ১৬০-১৬৫ টায় কেজি হবে তা মজুদ করতে হবে। এক্ষেত্রে থাই সরপুটি এর থেরেক ছোট আকারের পোনা মজুদ করলে মাছের টেকসই হার কম হবে। থাই সরপুটি মাছের সাথে সহযোগী মাছের চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশী জিওল মাছের পোনা, কাতলা এবং সিলভার কার্প মাছের পোনা মজুদেও নিম্নের সরণী অনুসরণ করা যেতে পারে।

১ শতক জলাশয় ঃ

পোনার প্রজাতির নাম	পোনার ন্যুনতম বয়স	পোনার আকার	পোনার সংখ্যা(শতক প্রতি)	পোনার স্বাস্থ্য
থাই সরপুটি	এক (১) মাসের উপর বয়স	১"-১.৫"	৬০০টি	সুঠামদেহ, স্বচ্ছ,সুস্থ, সবল
কাতলা	মাসের উপর বয়স	৪"-৫"	১০টি	"
সিলভার কার্প	"	৪"৫"	১০টি	"

গ. তেলাপিয়া মাছের চাষ ঃ

সার দেয়ার ৩-৪ দিন পর পুকুরে তেলাপিয়া মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। সেক্ষেত্রে পূর্ব হতেই পোনার ব্যাপারে যোগাযোগ করে চুক্তি করে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ভালজাতের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা সংগ্রহ করতে হবে এবং নুন্যতম ১"-১.৫" আকারের পোনা যা ১৬০-১৬৫ টায় কেজি হবে তা মজুদ করতে হবে। এর থেকে ছোট আকারের পোনা মজুদ করলে মাছের টেকসই হার কম হবে। তেলাপিয়ার মাছের সাথে সহযোগী মাছের চাষ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশী কাতলা এবং সিলভার কার্প মাছের পোনা মজুদের নিম্নের সরণী অনুসরণ করা যেতে পারে।

১ শতক জলাশয় ঃ

পোনার প্রজাতির নাম	পোনার ন্যুনতম বয়স	পোনার আকার	পোনার সংখ্যা(শতক প্রতি)	পোনার স্বাস্থ্য
তেলাপিয়া	এক (১) মাসের উপর বয়স	১"-১.৫"	১৫০-৩০০টি	সুঠামদেহ, স্বচ্ছ,সুস্থ, সবল
কাতলা	মাসের উপর বয়স	৪"-৫"	১০টি	"
সিলভার কার্প	"	৪"৫"	১০টি	"

রোগ বালাই ঃ

রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধই উত্তম। প্রথমে জানতে হবে কি কি কারণে মাছের রোগ হয় এবং আমরা যদি ঐ সকল কারণগুলো সফলভাবে সমাধান করতে পারি তবে আশা করা যায় মাছ রোগাক্রান্ত হবে না। রোগ প্রতিরোধের জন্য শীত আসার পূর্বে শতাংশ প্রতি ২৫০-৫০০ গ্রাম হারে চুন দিলে রোগ হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

অধিবেশন - ৪

কার্প নার্সারি ব্যবস্থাপনা

লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের এবং বড় আকারের মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া খুবই প্রয়োজন। সময়মত কাঙ্খিত আকারের পোনা না পাওয়ার জন্য অনেক মৎস্যচাষি ইপ্সিত উৎপাদন লাভে সমর্থ হয় না। ফলে দেশে সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন ব্যবহৃত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো উন্নত নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিক সময়ে ভল জাতের মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন। কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন কৌশল এ অংশে আলোচনা করা হলো।

স্থান নির্বাচন ঃ

মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য পুকুরের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাটির বৈশিষ্ট্য সাধারণ মাছ চাষের পুকুরের মতই। এছাড়া আরো যে সব বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো পুকুর খননের এলাকা হবে বন্যামুক্ত ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রুই জাতীয় মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণত দুই ধরণের পুকুর ব্যবহার করা হয়।

ক. নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর ঃ

যে পুকুরে রেণু ছেড়ে ধানী পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে নার্সারি বা আঁতুড় পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুর সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। পুকুরের গভীরতা থাকে তুলনামূরকভাবে কম। কাজেই যে সমস্ত ছোট, মাঝারি ও অগভীর পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনার আকার পর্যন্ত বড় করা হয়, সেগুলো আঁতুড় পুকুর নামে অভিহিত। এ পুকুরের আয়তন সাধারণত ১০-২৫ শতাংশ এবং পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট হয়ে থাকে। তবে প্রজাতি ভেদে আয়তন ও গভীরতার তারতম্য ঘটে থাকে।

খ. লালন বা চারা পুকুর ঃ

যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা (৫-১০ সেমি) পর্যন্ত বড় করা হয়, তাকে লালন বা চারা পুকুর বলে। বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর বা চাষাবাদ মৌসুমে পানির ব্যবস্থা থাকে, এমন ধরনের পুকুরে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর এবং লালন পুকুরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- পুকুরের পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত;
- পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো এবং বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- নার্সারি পুকুরের আয়তন হবে ১০-৫০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা হবে ১.০-১.৫ মিটার;
- লালন পুকুরের আয়তন হবে ২০-১০০ শতাংশ এবং পানির গড় গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হলে ভাল হয়;
- উভয় প্রকার পুকুর হবে আয়তাকার যাতে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়;
- পুকুরের তলায় ১০-১৫ সেমি -এর বেশি কাদা থাকবে না।

তবে একই পুকুরে একধাপ পদ্ধতিতেও রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা ঃ

১. জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ।

২. রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ।

৩. পুকুর মেরামত ও চাষ দেয়া।

৪. চুন প্রয়োগ বিষয়ে সাধারণ মাছচাষ অংশে আলোচিত হয়েছে।

৫. **পুকুরে পানি ভরাটকরণ :** পুকুর শুকানো হলে চুন প্রয়োগের ২-৩ দিন পর পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি সরবরাহ কালে যেন কোনো রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ ঢুকতে না পারে।

৬. **পোনা প্রাপ্তি নির্ধারণ :** পুকুরে সার প্রয়োগের ৩-৮ দিনের মধ্যে ফাইটোপ্লাংকটন, ৫-১০ দিনের মধ্যে রটিফার, ৮-১৪ দিনের মধ্যে ক্লাডোসেরা এবং ১২-২০ দিনের মধ্যে কপিপডের উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় থাকে। রেণুর জন্য যেহেতু

রটিফার জাতীয় খাদ্য দরকার। তাই রেণু প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ জেনে পুকুরে সার প্রয়োগ করলে পোনার উৎপাদন সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাবে।

৭. **সার প্রয়োগ :** পুকুরের নিজস্ব উৎপাদনশীলতার ওপর সার প্রয়োগের মাত্রা পুকুর থেকে পুকুরে ভিন্ন হয়। পুকুর প্রস্তুতকালীন সার ব্যবহারের মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

ইউরিয়া ঃ ১০০-৫০ গ্রাম / শতাংশ

টিএসপি ঃ ৫০-৭৫ গ্রাম / শতাংশ

পুকুরে পানির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগের মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। সার হিসেবে খৈলও ব্যবহর করা যেতে পারে। শতাংশ প্রতি ০.৫০ কেজি খৈল পুকুরে রটিফার (এক ধরণের প্রাণিকণা) উৎপাদনে সহায়ক।

৮. পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

রেণু / ধানী মজুদের আগেই পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। রেণুর পুকুরে পানির রং থাকবে লালচে সবুজ বা বাদামি সবুজ। খালি চোখে দেখতে হবে পানির রং ঠিক আছে কিনা। ঠিক থাকলে পরিমিত খাবার আছে কিনা তা নিচের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে।

সেকিডিস্ক ঃ

এটি একটি লোহার চাকা যার ব্যাস ২০ সেমি এবং রং সাদা -কালো। এটি ৩টি রংয়ের ১টি সুতা দ্বারা ঝুলানো থাকে। থালার গোড়া থেকে প্রথম অংশের রং লাল (২ সেমি), দ্বিতীয় অংশের রং সবুজ (১০ সেমি) এবং হাতে ধরার সর্বশেষ অংশের রং সাদা।

পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা ঃ

পুকুরে রেণু / পোনা ছাড়ার অন্তত একদিন আগে পুকুরের পানির বিষাক্ততা দূর হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়। কেননা পানিতে বিষক্রিয়া থাকলে রেণু / পোনা মারা যাবে।

বিষাক্ততা পরীক্ষা পদ্ধতি : পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দেখা, পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষ ক্রিয়া হয়েছে এ অবস্থায় পুকুরে পোনা মজুদ উচিত নয়, কিছু দিন অপেক্ষা করার পর আবারও বিষাক্ততা পরীক্ষা করে পোনা ছাড়া, পুকুরের বিষাক্ততার মাত্রা বেশি হলে পানি কমিয়ে এনে বা বদলিয়ে বিশুদ্ধ উৎসের পানি সংযোজন করতে হবে।

জলজ পোকা-মাকড় দমন পদ্ধতি ঃ

বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক বা ডিজেল/ কেরোসিন প্রয়োগ করে নার্সারি পুকুরের জলজ পোকা-মাকড় ভালোভবে দমন করা যায়। নিচে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

- সুমিথিয়ন: ২-৩ মিলি / শতাংশ / ফুট পানির গভীরতা।
- নোভান/ নগস: ২-৩ মিলি / শতাংশ / ফুট পানির গভীরতা।
- হাঁসপোকা সহ ক্ষতিকারক পোকা দমন- নার্সারি পুকুরে রেনু অবমুক্ত করার ৫৬-৭২ ঘন্টা পূর্বে ৩-৪ ফুট গভীরতার জন্য ডেলিটিক্স ১.৫ মি.লি./শতাংশ হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।

কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

প্রয়োজনীয় কীটনাশক একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লি. পরিমাণ পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ডিপটারেক্স প্রয়োগের পর জলজ পোকা-মাকড় মারা যাওয়া শুরু করলে সমস্ত পোকা-মাকড় চটজাল দ্বারা তুলে ফেলতে হবে। দুপুরে রোদে ব্যবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কম তাপমাত্রা, মেঘ, কিংবা বৃষ্টির সময় কীটনাশক ব্যবহার না করাই উচিত।

কীটনাশক ব্যবহারের সতর্কতা ঃ

- কীটনাশক ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীকে মুখ, শরীর কাপড়ে ঢেকে নিয়ে চশমা পরে নিতে হবে।
- বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।
- ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভাল করে গোসল করে নিতে হবে এবং সকল প্রকার কীটনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

ডিজেল বা কেরোসিন ঃ

- প্রতি শতাংশ জলাশয়ে ১২৫ মিলি বা প্রতি ১০ শতাংশ জলাশয়ে ১ লি. প্রয়োগ করতে হবে (গড়ে পানির গভীরতা ৩ ফুট)।
- পুকুরের পানি যখন ঢেউহীন অবস্থায় থাকবে তখন প্রয়োগ করতে হবে।
- পুকুরের পানিতে ঢেউ থাকলে চটজাল টেনে জালের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া ২/৩ বার করলে ভাল হয়।
- সমস্ত মরা পোকা-মাকড় তুলে ফেলতে হবে।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

রেণু পোনা দুই পদ্ধতিতে প্রতিপালন করা যায়। এ পদ্ধতি নির্ভর করে রেণু ছাড়ার পরিমাণের ওপর। এর পরিমাণ আবার নির্ভর করে রেণুর জাত, পুকুরের আয়তন ও তার উৎপাদনশীলতার ওপর। ছোট ও মাঝারি পুকুর অধিকতর উৎপাদনশীল বলে বিবেচিত। চাষির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

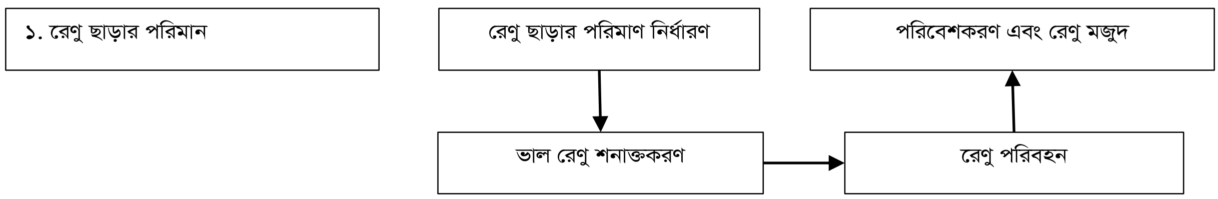

এক ধাপ পদ্ধতি ঃ

একই পুকুরে ২-৩ মাস রেণু ৫-১০ সেমি আকার পর্যন্ত লালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে রুইজাতীয় মাছের যে কোনো প্রজাতির ৪-৫ দিন বয়সের রেণু প্রতি শতাংশে ৮-১০ গ্রাম ছাড়া যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনায় রেণুর বাঁচার হার শতকরা ৫০-৬০%।

দুই ধাপ পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নার্সারিতে ৪-৫ দিন বয়সের রেণু শতাংশ প্রতি ২৫-৩০ গ্রাম করে মজুদ করা যায়। প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুরে রেণু ছেড়ে এবং ১০-১২ দিন পর ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থানান্তর করে ৬-৮ সপ্তাহ লালন করে ৭-১২ সেমি আকার চারা পোনা করা যায়। এ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ধানী পোনার বাঁচার হার শতকরা ৮০ ভাগ।

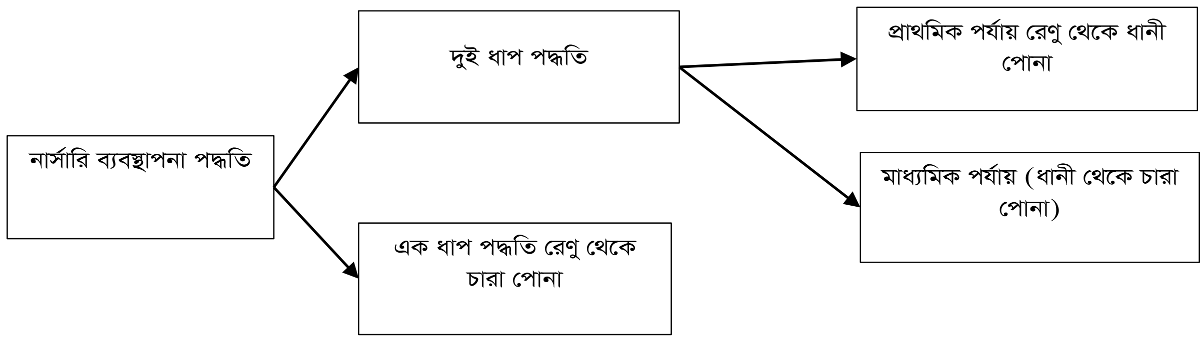

প্রজাতি অনুযায়ী গ্রাম প্রতি রেণুর সংখ্যা ঃ

প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা / গ্রাম	প্রজাতি	রেণুর সংখ্যা / গ্রাম
কাতলা	৪০০টি		
রুই	৪৭৫টি		
মৃগেল	৪০০টি		

রেণু ছাড়ার পরিমাণ ঃ

প্রজাতি	এক ধাপ পদ্ধতি	দুই ধাপ পদ্ধতি
কাতলা	১০ গ্রাম/ শতাংশ	৩০ গ্রাম/ শতাংশ
রুই	৮ গ্রাম/ শতাংশ	২৫ গ্রাম/ শতাংশ
মৃগেল	১০ গ্রাম/ শতাংশ	৩০ গ্রাম/ শতাংশ

- একটি নার্সারি পুকুরে একই প্রজাতির রেণু চাষ করা ভাল। নার্সারি পুকুরে রেনু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে।
- রেনু পোনা মজুদের এক ঘন্টা আগে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে ৫-৭টি করে সম্পূর্ণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেনু মজুদঘনত্ব: প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।
- রেনু পোনা খাপখাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্ড়ে ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।

ভাল রেণু শনাক্তকরণ ঃ

রেণু প্রাপ্তির উৎস দুইটি যথা: প্রাকৃতিক এবং হ্যাচারি। বাহ্যিক ও অনুকূল পরিবেশে মাছের প্রজনন ঘটে বিধায় প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর মান ভালো থাকে। তবে অসুবিধা হলো প্রয়োজনীয় সময়ে পরিমাণমত ইপ্সিত প্রজাতির রেণু না পাওয়া এবং এতে কাঙ্খিত ও অনাকাঙ্খিত রেণুর মিশ্রণ থেকে যায়। অন্যদিকে হ্যাচারির উৎপাদিত রেণু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদিত হয়। ফলে পছন্দ ও চাহিদামত প্রজাতির রেণু সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ব্রুড মাছের গুণগত মান, পুষ্টি বজায় রাখা না হলে রেণুর গুণগত মান খারাপ হতে পারে।

ভাল রেণু চেনার উপায় ঃ

- চলাফেরায় সন্তরণশীল, দেহের রং কালচে-বাদামি / সবুজ
- রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় এবং স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে সক্ষম।

পর্যবেক্ষণ বিষয়	ভাল রেণু	দুর্বল রেণু
দেহের রং	কালচে-বাদামি/সবুজ	ঘোলা, ফ্যাকাশে
আচরণ	চঞ্চল, দ্রুত সন্তরণশীল	অপেক্ষাকৃত ধীর, দুর্বল সন্তরণশীল
রেণুর পাত্রে হাত দেয়া	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায়	রেণুর পাত্রে হাত দিলে রেণু দ্রুত সরে যায় না

রেণু পরিবহণ ঃ

হ্যাচারি থেকে অক্সিজেন ব্যাগে রেণু পরিবহণ করতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে ব্যাগে যাতে কোনোভাবে ছিদ্র না হয় ব্যাগ ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে, বেশি ব্যাগ এক সাথে পরিবহন করা হলে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহ বা হাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৬০দ্ধ৪০ সেমি আকারের একটি পলিথিন ব্যাগে ৮-১০ ঘন্টার দূরত্বে ১২৫ গ্রামের বেশি রেণু পরিবহন করা উচিত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য পরিমাণ হলো ৩-৫ গ্রাম/লিটার পানি।

খাপ খাওয়ানো ও পুকুরে রেণু ছাড়া ঃ

রণুর ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। প্রথমে ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা এনে রেণু ছাড়তে হবে। এর জন্য রেণু পরিবহনকৃত ব্যাগটি ১০-১৫ মিনিট পুকুরে পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে। ব্যাগের মুখ আস্তে আস্তে খুলে হাত একবার ব্যাগের পানিতে আবার পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে তাপমাত্রা সমান আছে কিনা দেখতে হবে। থার্মোমিটারও ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগ ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান না হলে উভয় পানি বদলা-বদলী করতে হবে। এভাবে তাপমাত্রার ব্যধান ধীরে ধীরে কমে আসবে। রেণু ছাড়ার জায়গায় হাত দিয়ে তলদেশের পানি উপরের দিকে আন্দোলিত করে তাপমাত্রার সমতা আনতে হবে। তাপমাত্রার পার্থক্য যেন ২ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড এর বেশি না হয়। তাপমাত্রা সমতায় আসলে ব্যাগ কাত করে হালকা ঢেউ দিলে ব্যাগ থেকে রেণু ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। পাড়ের কাছাকাছি বাতাসের প্রতিকূলে রেণু ছাড়তে হবে। নার্সারি পুকুরে রেনু পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা-

- নার্সারি পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট করে নিয়ে সকালে সম্পূর্ণ পুকুরের তলায় মই দিতে হবে।
- রেনু পোনা মজুদের এক ঘন্টা আগে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রতি শতাংশে ৫-৭টি করে সম্পূর্ণ পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেনু মজুদঘনত্ব: প্রতি শতাংশে ৪০-৬০ গ্রাম রেনু মজুদ করা যায়।
- রেনু পোনা খাপখাওয়ানো- রেনু ছাড়ার সময় পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে রেনুপোনা বহনকারী অক্সিজেনযুক্ত ব্যাগের মুখ না খুলে পুকুরের পানিতে ১০-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে হাতের তালুতে পানি নিয়ে ব্যাগের ভিতর ঝরণার মত করে পানি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে ব্যাগের ভিতরের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা সমান বা কাছাকাছি হয়ে গেলে ব্যাগটি হাল্কা কাত করে আস্ড়ের ধীরে রেনু পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।
- রেনু পোনা শোধন- রেনু অবমুক্ত করার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শতাংশে ২ গ্রাম টিমসেন (৪০% এন-এলকাইল ডাই মিথাইল বেনজাইল এমোনিয়াম ক্লোরাইড, ৬০% স্ট্যাবিলাইজড ইউরিয়া) প্রয়োগ করলে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রেনুপোনাগুলো রক্ষা পায়।

রেণু ছাড়ার সময় ঃ

- সকালে অথবা বিকেল বেলা ছাড়াই উত্তম
- বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের দিনে রেণু ছাড়া ঠিক হবে না

রেণু ছাড়ার পর তিন দিন পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পানি অধিক সবুজ ও শেওলাযুক্ত হলে রৌদ্রজ্জল দিনে অধিক অক্সিজেন রেণুর মড়ক ঘটবে। এমতাবস্থায় পুকুরের তলার কাদা তুলে সারা পুকুরে ছিটাতে হবে যেন পানি ঘোলা হয়। এতে সূর্যের আলো বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে শেওলা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অধিক অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে না।

মজুদপরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে যে প্লাংকটন জন্মে, রেণু বা বড় পোনা তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া রেণু মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

রেণু মজুদের পর ৪টি কাজ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

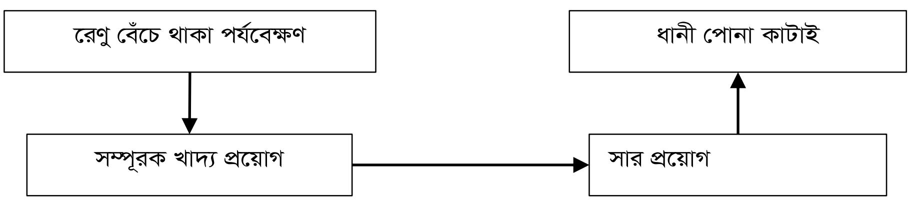

- প্রতিদিন ভোরে পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রেণু সাধারণত দল বেঁধে পুকুরের কিনার দিয়ে চলাফেরা করে, যা লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দেখা যাবে।
- গামছা বা কাপড় টেনে প্রতি টানে যদি ৫-১০ রেণু আসে তবে বুঝতে হবে বেঁচে থাকার হার ভাল।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ঃ

রেণুর জন্য পুকুরে সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূসি খাবার হিসেবে ব্যহার করা যায়। এসব খাদ্যে প্রোটিন মান কম কিন্তু প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক খাবার তৈরিতে সহায়ক। খৈলের পরিবর্তে ফিসমিল ব্যবহার করা যায়। আবার খৈল (৩৫-৪০%) ভূসির (২০-২৫%) সাথে গবাদি পশুর রক্ত (৩৫-৪০%) মিশ্রণে সম্পূরক খাবার অত্যন্ত কার্যকর। এ মিশ্রণ প্রয়োগে রেণু থেকে ধানী পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

খাদ্যের পরিমাণ ঃ

খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অবস্থা, রেণুর মোট ওজন, বয়স এবং তাপমাত্রার ওপর। সাধারণত রেণুর মোট ওজনের ২ গুণ হারে দৈনিক দু'বার খাবার দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ঃ

১-৫ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ২ গুণ/ দিন   ১১-১৫ দিন   মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৪ গুণ/দিন

৬-১০ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৩ গুণ/ দিন ১৬-২০ দিন মজুদকৃত রেণুর ওজনের ৫ গুণ/দিন

রেণু মজুদের প্রথম ৫ দিন শুধু খৈল প্রয়োগ সবচেয়ে ভাল। গবাদি পশুর রক্ত পাওয়া না গেলে খৈল ৫০ ভাগ ভূসি / কুড়া ৫০ ভাগ হারে ধান কাটাই না করা পর্যন্ত দিতে হবে। সরিষার খৈল অন্তত ১০ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে তার সাথে মিহি কুঁড়া/ ভূসি ভালোভাবে মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ রেণু মজুদের পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন নিম্নহারে অজৈব সার দিতে হবে।

সার	পরিমাণ (গ্রাম / শতাংশ / দৈনিক
ইউরিয়া	৪-৫
টিএসপি	৩

প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

অজৈব সার পুকুর প্রস্তুতকালীন পদ্ধতির অনুরূপ

- রেণু মজুদের পর আরও সে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে;
- খুব সকালে রেণু ভেসে উঠতে পারে। তখন পানির ঝাপটা, সম্ভব হলে নতুন পানি দিতে হবে;
- সকালে ও বিকালে হররা টেনে তলার বিষাক্ত গ্যাস বের করে দিতে হবে;
- রেণু চাড়ার ৫-৭ দিনের মধ্যে চট জাল টানা যাবে না ও মেঘলা দিনে সার ও খাবার দেয়া যাবে না;
- অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে পানি গরম হয়ে গেলে ছায়া ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্ভব হলে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে হবে।

ধানী পোনা কাটাই ঃ

রেণুপোনা আরো বড় হয়ে ধানের আকার বা ১.৫-২ সেমি এর বড় হলে, তাদেরকে ধানীপোনা বলে। নিয়মিত সার ও খাবার দিলে ১০-১২ দিনের মধ্যেই ধানীপোনা কাটাই বা স্থানান্তর করা যায়।

- কাটাই পদ্ধতি ও সময়-সকাল বেলাতেই ধানী কাটাই করা ভালো। কাটাই করার আগের দিন পুকুরে জাল টেনে পোনাগুলেকে অল্প পানির ঝাপটা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। পরদিন সকলে জাল টেনে, সতর্কতার সাথে পোনাগুলোকে একত্র করে বার বার পানির ঝাপটা দিতে হবে। তারপর অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বা পলিথিন ব্যাগে কম ঘনত্বে ধানী পোনা লালন পুকুরে স্থান্তর করা উচিত।
- ধানী থেকে চারা পোনা উৎপাদন- ধানী পোনা আরো বড় হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো বা আরো বড় আকার ধারণ করলে (৭ সেমি এর উপর, ওজন ৫-২৫ গ্রাম) তাদেরকে চারাপোনা বলে।
- পুকুর প্রস্তুতি - নার্সারি পুকুরের মত লালন পুকুরও এই নিয়মে তৈরি করা হয়। তবে কোন কীটনাশক ব্যবহারের দরকার নেই।

মজুদ ঘনত্ব এবং হার ঃ

- প্রতি শতাংশ ধানী মজুদ করা যাবে ৮০০-১০০০টি (একক বা মিশ্র)
- একই পুকুরে এক জাতের অথবা বিভিন্ন জাতের ধানী একসাথে মজুদ করা যাবে।
- আলাদা আলাদা পুকুরে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধানী মজুদ করা ভাল।

পোনা পরিবহন ও ছাড়া ঃ

- পলিথিন ব্যাগ, পাতিল বা ব্যারেলে ধানী পরিবহন করা যায়। পরিবহন ঘনত্ব নির্ভর করে পোনার প্রজাতি, শারীরিক অবস্থা, দূরত্ব এবং তাপমাত্রার ওপর।
- রেণু ছাড়ার মতোই পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে সহনশীল করে আস্তে আস্তে ধানী ছাড়তে হবে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ

- প্রতিদিন পোনাকে তাদের ওজনের ৫-১০% হারে খাবার দেয়া উচিত।
- পোনার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চালের মিহি কুঁড়া / গমের ভূসি ও খৈল ব্যবহার করা যায়।
- ভালো উৎপাদনের জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দরকার, খাদ্যে প্রোটিন পরিমাণ ২৫-৩০% হলে ভাল হয়।
- রক্ত/ ফিসমিল ব্যয় সাধ্য। এগুলো না পাওয়া গেলে খৈল ৫০ ভাগ ও ভুসি ৫০ ভাগ হারে ব্যবহার করা যাবে।
- প্রতিদিন মোট খাবারের অর্ধেক সকালে এবং অবশিষ্ট বিকেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে।

  ট্রেতে খাবার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

  নার্সারী পুকুরে দৈনিক খাবার দেয়ার ন্যায় নিচের সরনীর নির্দেশনা অনুসরন করা যেতে পারে।

নার্সারী পুকুরে খাদ্য সরবরাহের তালিকা ঃ

দিন/রেণুর বয়স	রেণুর ওজন	খাদ্য	প্রয়োগ মাত্রা
১-৩ দিন	১০০ গ্রাম	আটা/ময়দা- ১০০ গ্রাম হাঁসের সিদ্ধ ডিমের কুসুম- ১টি	৩ বারে প্রয়োগ, সকাল-৮.০০ টা, সন্ধ্যা-৬.০০টা ও রাত্রি ১০.০০ ঘটিকায়
৪-৭ দিন	১০০ গ্রাম	৩৫-৪০% প্রোটিন সমৃদ্ধ নার্সারী ফিড (পাউডার) ১০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
৮-১০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ২০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
১৬-২১ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৪০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা
২২-৩০ দিন	১০০ গ্রাম	উন্নত নার্সারী ফিড পাউডার ৫০০ গ্রাম	২ বারে প্রয়োগ, ভোর- সন্ধ্যা

সার প্রয়োগ ঃ

নার্সারি পুকুরের মতো লালন পুকুরে নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রয়োগ মাত্রা এবং পদ্ধতি নার্সারি পুকুরে সার প্রয়োগের মতোই, তবে পানিতে মাছের প্রাকতিক খাদ্যের অবস্থা অনুযায়ী সার কম বেশি হবে। পানির রং বেশি সবুজ হলে মেঘলা দিনে পুকুরে সার ও খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

হররা টানা ঃ

পোনা মজুদের পর মাঝে মাঝে সকালে / বিকেলে হররা টেনে দিলে পুকুরের তলায় বিষাক্ত গ্যাস জমতে পারবে না।

নমুনায়ন ঃ ২-৩ সপ্তাহ পর পর জাল টেনে পোনার স্বাস্থ্য, ওজন এবং আনুমানিক বেঁচে থাকার হার পরীক্ষা করাসহ পোনার খাদ্য মাত্রার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

অধিবেশন - ৫

বসত বাড়ীর আঙ্গিনার এক টুকরো জমিতে চৌব্বাচ্চায় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নারীর উদ্যোগে থাই কৈ, ভিয়েতনামী কৈ, তেলাপিয়া,শিং মাছ কিংবা গলদা চিংড়ির চাষ

৫.১ বায়োফ্লক মৎস্যচাষ ঃ

ক্রমবর্ধমান মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে দিন দিন কৃষিজ জমি ও পানির ওপর চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিজ জমি সুরক্ষা ও ভূ-গভৃস্থ পানির ব্যবহার কমাতে সরকারের নীতি এখন বেশ রক্ষণশীল। এমতাবস্থায় দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা মেটাতে মৎস্যচাষে বিদ্যমান উন্নত-সনাতন বা আধা-নিবিড় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে আরও নিবিড় চাষের দিকে যাওয়ার বিকল্প নেই। প্রচলিত নিবিড় চাষে নিয়মিত খামারের পানি পরিবর্তন করায় প্রচুর বর্জ্য পরিবেশে চলে আসে। অধিকন্তু, নিবিড় চাষে চাষিরা নির্বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। উচ্চ ঘনত্বে নিবিড় চাষে প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মৎস্যখাদ্যের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি মৎস্যচাষের খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার, ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মৎস্যচাষের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব। বাংলাদেশ একটি জনবহুল রাষ্ট্র বিধায় ভূমি ও পানির সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যাদের পুকুর নেই বাড়ির ভিটায় ২/৩ শতক জমি আছে যেখানে কোন প্রযক্তি পেলে মাছ চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা কিছুটা হলেও টোতে পারে। সেক্ষেত্রে বসত বাড়ির পার্শ্বের এক টুকরো জমিতে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মৎস্যচাষ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

৫.২ বায়োফ্লক সম্মন্ধে প্রাথমিক ধারনা ঃ

বায়োফ্লক হলো প্রোটিনসমৃদ্ধ জৈব পদার্থ ও অণুজীব যেমন-ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম, প্রোটোজোয়া, এ্যালজি, অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের মল এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী ও মৃত প্রাণী) এর দলা (Aggregation) (চিত্র ১)। এটি মূলত প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, হিউমিক পদার্থ, নিউক্লিক এসিড ও লিপিড এর সমন্বয়ে গঠিত। শুষ্ক বায়োফ্লকে প্রায় ৫০% প্রোটিন, ৩৬% শর্করা, ১.১৫% চর্বি, ১৩.৪% অ্যাশ, ১২.৬% ক্রুড ফাইবার, ১.২৮% ক্যালসিয়াম, ১.৩% ফসফরাস, ১.২৭% সোডিয়াম, ০.৭৫% পটাশিয়াম ও ০.৪১% ম্যাগনেশিয়াম থাকে (কঁযহ বঃ. ধষ., ২০০৯)। বায়োফ্লককে ফিশমিলের বিকল্প হিসেবে মৎস্য খাদ্যের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তির মূলনীতিই (Principle of Biofloc Technology) হল নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পুকুরে প্রচুর খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। খাদ্য হতে ব্যাকটেরিয়া, ডায়াটম, প্রোটোজোয়া, এ্যালজি, অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের মল এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী ও মৃত প্রাণীর খাদ্য দলা তৈরী যা কাংখিত মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়।

৫.৩ : বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে দুই ভাবে মাছ চাষ করা যায় ঃ

(ক) আউটডোর : এ প্রযুক্তিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পুকুর বা ট্যাংকে মাছচাষ করা হয়।এই পদ্ধতিকে সবুজ পানির বায়োফ্লক (greenwater biofloc) প্রযুক্তি বলা হয়। এখানে প্ল্যাংকটন ও ব্যাকটেরিয়া যৌথভাবে পানির মান মান নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে।

(খ) ইনডোর : এ প্রযুক্তিতে সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে ঘরের ভেতর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ট্যাংকে মাছ চাষ করা হয়। এখানে হেটারোট্রিটিক ব্যাকটেরিয়া পানির মান নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা রাখে। একে বাদামী পানির বায়োফ্লক (Brownwater biofloc) প্রযুক্তি বলা হয়।

ইনডোর ট্যাংকে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ঃ

ইনডোর ট্যাংকে মাছচাষের ক্ষেত্রে ট্যাংকের সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কৃত্রিম এয়ারেশন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। আংশিক পানি পরিবর্তন বা আহরণ সহজতর করতে ট্যাংকে পানি নির্গমন ব্যবস্থা সংযোজিত থাকে। ট্যাংকের আকার গোলাকার, বর্গাকার, আয়তাকার বা উপবৃত্তাকার হতে পারে। তবে গোলাকার হলে পানি সঞ্চালন ভালো হয় যা মাছকে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুভূতি দেয়। ট্যাংক পুরু পলিইথিলিন, তারপুলিন, স্টীলের সীট, ইট-সিমেন্ট-কংক্রিট অথবা ফাইবার গ্লাস দ্বারা নির্মিত হতে পারে। এমনকি কাঠ বা প্লাই উডের ফ্রেমে এবং হাই ডেনসিটি পলিইথিলিনের (HDPE) সমন্বয়ে সস্তায় ট্যাংক নির্মাণ করা যেতে পারে। কম খরচে ট্যাংক তৈরির জন্য বাঁশ, রড বা স্টেইনলেস স্টিলের ফ্রেম করা যায়। তারপর ফ্রেমের ভিতর দিক থেকে প্লাস্টিক ইনসুলেটর বেঁধে নিয়ে তারপুলিন বা পলিথিন ছড়িয়ে দিয়ে ট্যাংক তৈরি করতে হয়। নির্মানকালে ট্যাঙ্কের নীচে কয়েক ইঞ্চি পুরু বালির স্তর দ্বারা তলা সমতল ও কেন্দ্র বরাবর সামান্য ঢালু করা হয় এবং কেন্দ্র হতে বহির্গামী একটি ড্রেন বা ড্রেনেজ পাইপ লাইন বাহির পর্যন্ত পুঁতে রাখা হয় যার দ্বারা প্রয়োজন মতো গাঁদ (Sludge), তলানী বা পানি বের করা হয়। কেন্দ্রের ড্রেনেজ পাইপটি এ্যালবো দ্বারা ট্যাংকে ব্যবহৃত তারপুলিন বা পলিথিনের সাথে ভালোভাবে সংযুক্ত করতে হয় যেনো কোনো প্রকার অনাকাংখিত ছিদ্র হবার সুযোগ না থাকে।

নিবিড় চাষে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে ট্যাংকের আকার খুব বড় হওয়া উচিত নয়। বড় ট্যাংকে অধিক ঘনত্বে মাছ/চিংড়ি চাষে ট্যাংকের মাটে জীবভর অত্যাধিক বেড়ে যায়, অধিক পরিমাণ পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়, যা সামগ্রিক ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত ইনডারের বায়োফ্লক ট্যাংকগুলারে আয়তন ৫০০০ লিটার হতে ৫০০০০ লিটার পর্যন্ত হতে পারে।

ট্যাংকের প্রকারভেদ: ১. প্লাস্টিক ট্যাংক ২. তারপলিন ট্যাংক ৩. কনক্রিটের (সিমেন্টেড) ট্যাংক

১.প্লাস্টিকের ট্যাংক নির্মাণ ঃ

লোহার ফ্রেমকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করে প্লাস্টিকের ড্রাম দিয়ে স্বল্প মূল্যে খুব সহজেই বায়োফ্লকের জন্য ট্যাংক তৈরি করা যায়। ১০০ লিটারের ক্যামিকেলের প্লাস্টিকের ড্রামকে ট্যাংক তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। ছোট আকারের ট্যাংক ঘরের ব্যালকনি বা বারান্দায় স্থাপন করা যায়। বাজারে প্রাপ্ত যে কোন কোম্পানির (গাজী বা মদিনা) প্লাষ্টিকের ট্যাংক বা ফাইবার গ্লাস ট্যাংক এ ক্ষেত্রে সহজেই ব্যবহার করা যায় ।

২. লোহার ফ্রেম ও তারপলিন দিয়ে ট্যাংক নির্মাণ ঃ

লোহার ফ্রেম (৬ মি.মি.) দিয়ে ট্যাংক নির্মাণ করা যায়। লোহার জালি দিয়ে বানালে চতুর্দিক পুরো এরিয়া রাবার কার্পেট বা ফ্লোর ম্যাট দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হয়। এরপর তারপলিন দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হবে যাতে পানি লিক না করে। ট্যাংকের মাঝখান বরাবর পানি একটি নিষ্কাশন পাইপ বসাতে হবে। যাতে করে ফ্লকের ঘনত্ব বেশি হলে পানি বাইরে বের করে দেয়া যায়। আধার তৈরির পূর্বে স্থানটিকে পরিমাণমত মেপে নিয়ে ২০ সেমি গভীর করে বৃত্তাকার ড্রেন তৈরি করতে হবে। রড দ্বারা ১ মিটার উচ্চতার গালোকার তৈরিকৃত বেড়াটি উক্ত ড্রেনে স্থাপন করে মাটি দ্বারা দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে দিতে হবে। বৃত্তাকার স্থানটির মেঝে কেন্দ্রদিকে ৩-৪ সেমি ঢালু হতে হবে। এবার উক্ত খাঁচার মাঝে প্রয়োজণীয় আকারের তারপলিন স্থাপন করতে হবে। তারপলিনের আধারটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য তারপলিন স্থাপনের পূর্বে রাবার কার্পেট বা ফ্লোর ম্যাট বা পিফম দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হয়।

১০০০০ লিটার পানিধারণ ক্ষমতার একটি ট্যাংক তৈরিতে: বেড়ার দৈর্ঘ্য হয় ৪১ ফুট, যাতে ৬ মিমি বড় লাগবে ৬২ কেজি পিফম লাগবে ৮০০ বর্গ ফুট, বৃত্তের ব্যাস হবে ১৩ ফুট উচচ তা হবে ৩ ফুট, মজুরী আনুমানিক ২০০০ টাকা, এলবো লাগবে ২টি ৩ ইঞ্চি পাইপ লাগবে মোট ১৬ ফিট। ১০০০০ লিটারের ট্যাংক তৈরিতে মোট আনুমানিক খরচ ২০০০০/- টাকা ।

৩.কনক্রিটের তৈরি ট্যাংকে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছচাষ কংক্রিটের ট্যাংক নির্মাণ ঃ

ইট, সিমেন্ট ও বালু ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় আকারে গোলাকৃতি, ডিম্বাকার, বর্গাকৃতি, আয়তাকৃতির ট্যাংক তৈরি করা যেতে পারে। তবে গোলাকৃতি ট্যাংক অধিক উত্তম। গোলাকৃতি ট্যাংকে এ্যারেশন বা পানির মিশ্রণ এবং তলানি জমাতে বা অপসারণ করতে সহজতর হয়। এধরনের ট্যাংক তৈরির সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যেন দেয়াল বা মেঝে মশ্রিণ হয়। তবে সিমেন্টের ট্যাংক এপক্সি। পেইন্ট দ্বারা প্রলেপ দিতে পারলে ট্যাংক বেশি দিন টেকশই হবে এবং সহজে ড্যাম হবে না বা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার তৈরির আধারে পরিণত হবে না। সিমেন্টের নতুন ট্যাংকে মাছ ছাড়ার পূর্বে কয়েক দিন পানি দিয়ে ভরে রাখতে হবে যাতে সিমেন্টর ক্ষতিকর ক্রিয়া দূর হয়।

পাবদা/গলশা/শিং চাসের জন্য ১০-১৫ হাজার লিটার ট্যাংক এবং তেলাপিয়া চাষের জন্য ১৫-২০ হাজার লিটারের ট্যাংক নির্মাণ প্রোয়জন।

ট্যাংক প্রস্তুতি :

১. ১ম দিন পটাশিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট বা সাবান দিয়ে ট্যাংক পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার করার পর ১ দিন ট্যাংক শুকিয়ে নিতে হবে।

২. ৩য় দিন ট্যাংকের অর্ধেক পানি দিয়ে পূর্ণ করে প্রতি টন পানির জন্য ৩০ গ্রাম হারে ব্লিচিং পাউডার বায়াফ্লেক করে অ্যারেশান দিতে হবে।

৩. ৪র্থ দিন প্রতি টন পানির জন্য ৫০ গ্রাম হারে ফিটকিরি দিতে হবে (পানিতে যদি আয়রন থাকে)। পানিতে অতিরিক্ত আয়রণ থাকলে তা অবশ্যই ফিল্টার করে নিতে হবে। অ্যারেশন দিতে হবে পানির তিন স্তরে- উপর, মাঝের ও নীচের স্তরে।

৪. ৫ম দিন পানির টিডিএস এবং পি.এইচ পরীক্ষা করতে হবে। টিডিএস থাকতে হবে ১৫০০-১৮০০ মি.গ্রাম/লিটার এবং পি.এইচ থাকতে হবে ৭ এর উপর।

৫. সাধারণত টিডিএস ৫০০ মি.গ্রাম/লিটার এর নিচে থাকে, তাই কাঙ্খিত মাত্রার টিডিএসের জন্য প্রতি লিটার পানির জন্য ১ গ্রাম হারে লবন প্রয়োগ করতে হবে।

৬. ৬ষ্ঠ দিন পুনরায় অ্যারেশন দেওয়ার পর প্রতি ১০০০ লিটার পানির জন্য ১০০ গ্রাম চুন প্রয়োগকরতে হবে।

অ্যারেটর স্থাপন ঃ

বোয়াফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষের মৌলিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম অত্যাবশ্যকিয় উপসংগ পর্যাপ্ত এ্যারেশন। অক্সিজেনের স্বল্পতা ট্যাংকের মাছের উৎপাদন কমায়, পানোর বাঁচার হার কমায়, মাছকে পিড়ন অবস্থার মধ্যে ফেলে, মাছে রোগ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি মাছের মৃত্যু ঘটাতে পারে। বায়োফ্লক প্রযুক্তির মাছচাষে মাছের ঘনত্ব থাকে বেশি এ জন্য স্বল্প সময়ের অক্সিজেন স্বল্পতা বা এ্যারেশন বন্ধের কারণে ট্যাংকে ব্যাপক মাছের মৃত্যু ঘটাতে পারে। সাধারণভাবে পানিতে ৫ পিপিএম অক্সিজেন থাকে কিন্তু বায়োফ্লক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পানিতে কমপক্ষে ৭ পিপিএম অক্সিজেন রাখতে হবে। ট্যাংকের তলার তলানীর পচনের কারণে ট্যাংকে মাটে অক্সিজেন চাহিদা অনেক সময় খুব বেড়ে যায়। এজন্য এ প্রযুক্তিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে এ্যারেটরের বিকল্প কিছু নাই। ব্লোয়ার বা হাইড্রোফোনিক পাম্প সেট করে অ্যারেশান দিতে হবে। ১০ হাজার লিটার পানির ট্যাংকে ৭-৮ পিপিএম অক্সিজেন পাওয়ার জন্য ৮০ ওয়াটের একটি অ্যারেটর ব্যবহার করতে পারেন। হাইড্রোফোনিক পাম্পের সাহায্যে ট্যাংকের তলায় পাইপলাইনের মাধ্যমে চাকতির মধ্যে দিয়ে অ্যারেশান দেওয়া যেতে পারে।

প্রাবোয়োটিক তৈরি ঃ

- ১ কেজি আতপ চাল ধুয়ে ৫০০ মিলি, পানি বোতল বা কাঁচের জারে টিস্য বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে (যাতে গ্যাস বের হয়ে যেতে পারে) ছায়াযুক্ত স্থানে ৭ দিন রাখতে হবে।
- ৭ দিন পর Lactobacilus স্যারাম তৈরি হবে।
- অতপর ৫০০ মিলি Lactobaciluis স্যারামের সহিত ৫০০ গ্রাম মোলাসেস (চিটাগুড়) ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে বায়ুনিরোধী জারের মধ্যে ৭-১০ দিন রাখলে প্রোবায়োটিক তেরি হবে। [প্রোবায়োটিক দ্রবণের pH= ২.৮-৩,৫]

প্রোবায়োটিক প্রয়োগ ঃ

- ৫ মি.লি. প্রোবায়োটিক দ্রবণের সাথে ৫০ গ্রাম চিটাগুড় প্রতি ১০০০ লিটার পানির জন্য প্রয়োগ করতে হবে।
- এভাবে ৭-১০ দিন ট্যাংকে হাই-অ্যারেশন প্রয়োগকরলে ফ্লক তৈরি হয়ে যাবে।
- প্রথমে মোলাসেস মেশাতে হবে, কিছুক্ষণ পর প্রোবায়োটিক মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা পর সন্ধ্যার পর ট্যাংকে প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেনের উৎসের জন্য ট্যাংকে প্রোবায়োটিক প্রয়োগের ২-৩ দিন পর প্রতি ১০০০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছের খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- অ্যামানিয়ার পরিমাণ যখন ০-এর কাছাকাছি থাকবে তখন বায়োফ্লক সিস্টেম মাছ ছাড়ার জন্য তৈরি হবে। ফ্লকের ঘনত্ব কম হলে প্রোবায়োটিক দিতে হবে। অন্যদিকে ফ্লকের ঘনত্ব বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে।

FCO (এফসিও) ঃ

FCO হচ্ছে Fermented Carbon Organic বা গাঁজনকৃত কার্বন জৈব। সুপ্ত অবস্থায় থাকা ব্যাকটেরিয়াকে মোলাসেস ও র-সল্টের উপস্থিতিতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কালচার করে FCO তৈরি করে ব্যাকটেরিয়াকে সক্রিয় করা হয়। বায়োফ্লকের ট্যাংকে ফ্লক তৈরিতে এই FCO ব্যবহার করা হয়। ট্যাংকে সরাসরি প্রোবায়োটিক প্রয়োগকরলে এফসিও প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। ট্যাংকে সরাসরি এফসিও প্রয়োগ করা হলেও ফ্লকের ঘনত্ব যদি হ্রাস পায় তাহলে এফসিও দেওয়া যেতে পারে।

FCO তৈরির পদ্ধতি ঃ

একটি বালতি/ড্রামে ২০ লিটার পানি, ২০০ গ্রাম লবন (র সল্ট), ১ কেজি চিটাগুড় (মোলাসেস), ৫০-১০০ গ্রাম প্রোবায়োটিক (অণুজীবের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে) ভালোভাবে মিশিয়ে অ্যারেশন দিয়ে ৩-৫ দিন (তাপমাত্রা ২৫০ সে. এর নীচে হলে ৫ দিন, তাপমাত্রা ২৫০ সে. এর উপরে হলে ৩ দিন) বায়ুরোধী (Airtight) অবস্থায় রাখলে FCO তৈরি হবে। খেয়াল রাখতে হবে বায়ুরোধী অবস্থায় পাত্রটির অর্ধেক যেন খালি থাকে। বায়ুরোধী না করেও এফসিও তৈরি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সময় একটু বেশি লাগে (৭-১০ দিন)। এফসিও তৈরি হয়ে গেলে গাঢ় বাদামী রং ধারণ করে এবং গাজনকৃত কার্বনের বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। উক্ত এফসিও প্রতিদিন ১০০০০ লিটার বায়োফ্লক ট্যাংকে ৫০০ মিলিলিটার এফসিও প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে একবার তৈরিকৃত এফসিও ১৫-২০ দিন ব্যবহার করা যাবে। এসময় অ্যারেশন চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রতিদিন ৫০ গ্রাম মোলাসেস পাত্রে যোগ করতে হবে।

ফ্লকের ঘনত্ব নির্ণয় ঃ

সঠিক উৎপাদন প্রাপ্তির জন্য প্রতি লিটারে ২৫-৩০ মি.লি ফ্লক প্রয়োজন। ১ লিটারের একটি বোতলের তলদেশ কেটে মুখ শক্তভাবে বন্ধ করে ঠুকের ঘনত্ব নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে। বোতলের মুখ নিচের দিকে করে ৩০ মিলি পর্যন্ত একটি দাগ কেটে নিন। এখন বোতলটিতে পানিপূর্ণ করে ২৫-৩০ মিনিট রেখে দিলে নিচে ফ্লক জমা হবে । জমাকৃত ফ্লক ৩০ মি.লি. এর দাগ অতিক্রম করলে বুঝবেন সিস্টেমে ফ্লকের ঘনত্ব ঠিক রয়েছে। ট্যাংকে বায়োফ্লকের ঘনত্ব পরিমাপ করার জন্য ইমহফ কোন ব্যবহার করতে পারেন।

ফ্লক পরীক্ষা করা ঃ

- ৭-১০ দিন পর ট্যাংকে সাদা রংয়ের পদার্থ জমা হতে থাকে।
- ট্যাংক থেকে এই সাদা পদার্থসহ কিছু পানি নিয়ে একটা কাপড় দিয়ে হেঁকে পানি ফেলে দিতেহবে এবং কাপড়ের উপর জমা হওয়া পদার্থগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।
- এখন একটা তেলাপিয়াকে এনে একটা বালতির পানির মধ্যে ১ দিন রাখুন।
- এরপর সংগৃহীত পদার্থগুলো (ফ্লক) ঐ বালতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।
- যদি তেলাপিয়া ফ্লকগুলো খেয়ে ফেলে তবে বুঝতে হবে ফ্লক তৈরী ১০০ ভাগ সফল।
- যদি আধাআধি খায় তবে বুঝতে হবে ফ্লক এখনো পুরো হয়নি। যদি না খায় তবে বুঝতে হবে। পদার্থগুলো ফ্লক নয় অন্য কিছু।
- যদি ফ্লক না আসে তবে প্রোবায়োটিক ও মোলাসেস আবারো মিশাতে হবে।

পানিতে যথাযথ পরিমাণ ফ্লক তৈরি হলে ঃ

১. পানির রং ঘালোটে বাদামী বা সবুজাভ দেখা যায়।

২. পানিতে নিমজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দেখা যায়।

৩. পানির অ্যামানিয়া পরীক্ষা করলে পানি অ্যামোনিয়া মুক্ত বা কম পরিমানে দেখায়।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন (Suitable Species for Biofloc Technology) ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিক প্রজাতি নির্বাচন ও পোনা মজুদ।

- যেসব মাছ মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে ও উচ্চ মাত্রার কঠিন পদার্থ(Suspended solid) সহ্য । করতে পারে সেসব প্রজাতি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযোগী।
- চিংড়ি ও তেলাপিয়া/শিং মাছ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে চাষের জন্য উপযুক্ত।
- তবে ইতামেধ্যে অনেক মৎস্যচাষি বায়োফ্লক পদ্ধতিতে শিং, পাবদা, গুলশা চাষ করছেন।
- যারা নতুন করে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছচাষ শুরু করতে চান তারা অবশ্যই প্রথমে তেলাপিয়া ও শিং দিয়ে চাষ শুরু সমীচীন হবে।

পোনা শোধন ও অবমুক্তকরণ ঃ

বায়োফ্লক ট্যাংকে পোনা ছাড়ার পূর্বে পানোকে অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। একটি বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে তাতে ২ গ্রাম ডাক্তারি পটাশ বা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট মিশাতে হবে। অতঃপর পানোকে ৩০ সেকেন্ড সময়ে জন্য চুবিয়ে নিতে হবে। অথবা, পানিতে ১০ গ্রাম/লিটার লবন মিশ্রিত করে তাতে ৫-১০ মিনিট পোনা চুবিয়ে নিতে হবে। মাছ ছাড়ার পুর্বে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে। পানির সকল নিয়ামক সঠিক থাকলে পানো মজুদ করা যেতে পারে। পানিতে ফ্লক তৈরি করে নিয়ে তারপর পোনা মজুদ করা যেতে পারে অথবা ফ্লক তৈরির পূর্বেও পানো মজুদ করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ :

- বায়োফ্লক এর পরিমাণ ২৫-৩০ মি.লি./লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে।
- কৈ/পাবদা/গুলশা/শিং-১০০০ পিস/১০০০ লিটার ট্যাংকে
- তেলাপিয়া-৪৫০ পিস/১০০০ লিটার ট্যাংকে
- পাবদা/গুলশা/শিং:৫০-৬০ কেজি উৎপাদন/১০০০ লিটার
- তেলাপিয়া: ৮০ কেজি উৎপাদন/১০০০ লিটার

খাদ্য প্রয়োগ ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে পানির গুণাগুণ রক্ষা, ফ্লক তৈরি, কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ঠিক রাখা, মাছের দৈহিক বৃদ্ধি চলমান রাখা ইত্যাদি সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। প্রজাতিভেদে দিনে দুই থেকে তিন বার খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে এমন আকারের পোনা মজুদ করতে হবে যাতে ০.৫ মি.মি. আকৃতির খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। চিংড়ি, শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা ইত্যাদি নিশাচর মাছের ক্ষেত্রে রাতে ও ভারে খাদ্য প্রয়োগ হয়। প্রতি সপ্তাহে বা পনেরো দিন। পর পর নমুনায়ন করে খাদ্যের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে। খাদ্য প্রয়োগের পর মাছ খাদ্র গ্রহণ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্য প্রয়োগের ০৫ মিনিটের মধ্যে মাছ তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে ফেলবে।

পানি পরিবর্তন ও রোগ প্রতিরোধ ঃ

ফ্লকের ঘনত্ব বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে ১০-১৫% পানি পরিবর্তন করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষে যেহেতু অধিক ঘনত্বে মাছচাষ করা হয়, তাই মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মাছ রোগাক্রান্ত হলে পানি পরিবর্তন করে জীবাণুনাশক দিয়ে মাছের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। প্রতি হাজার লিটার পানিতে ২-৩ মি.লি, (গ্রাম) ৮০% বেনজালিকোনিয়াম ক্লোরাইড (টিমসেন/একোয়াসলভ/ মাইক্রোনিল) জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিয়মিত ৩০-৩৫% প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কাঙ্খিত মাত্রায় রাখার জন্য বাহির হতে জৈব কার্বন সরবরাহ করতে হবে।

প্রজাতি	**১ম ২ সপ্তাহ**	**২য় ২ সপ্তাহ**	**৩য় ২ সপ্তাহ**	**৪র্থ ২ সপ্তাহ**	**৫ম ২ সপ্তাহ**	**পরবর্তী সময়ে**
তেলাপিয়া	৬%	৫%	৪%	৩%	২%	১%
শিং/পাবদা/গুলশা	৭%	৬%	৫%	৪%	৩%	২%

কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা ঃ

খাদ্য উপাদানে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত নিম্নরুপ-

খাদ্যে প্রোটিনের পরিমান	**কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত**
১৫	২১.৫
২০	১৬.১
২৫	১২.৯
৩০	১০.৮
৩৫	৯.২
৪০	৮.১

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাঙ্খিত মাত্রায় কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা। একটি ৩০-৩৫% প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত থাকে ৯-১০:১। এই অনুপাত যদি ১৫:১ রাখা যায় তবে হেটারেট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ও অ্যামোনিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। খাদ্য প্রোটিনের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। তাছাড়া পানিতে সরাসির কার্বোহাইড্রেট (কার্বন উৎস) সরবরাহের মাধ্যমেও কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের কার্বোহাইড্রেট যেমন-মোলাসেস, আটা, ময়দা, চালের কুঁড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।এসব খাদ্য উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন ও কার্বনসমৃদ্ধ। প্রয়োগকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ মাছ খায় না। খাদ্যে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেন এর যথাক্রমে মাত্র ১৫ ও ২৫ ভাগ মাছের শরীরে কাজে লাগে (এসিমিলেট হয়)। বাকী অংশ অব্যবহৃত খাদ্য ও মাছের মলের সাথে পানিতে থেকে যায়, যা পচে মাছের জন্য ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে। পানিতে বিদ্যমান হেটারোট্রিপিক ব্যাকটেরিয়া পানির জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেনকে (অ্যামোনিয়া অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য) গ্রহণ করে নিজেদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য তাদের নাইট্রোজেনের পাশাপাশি কার্বনের প্রয়োজন হয়। পানিতে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত পনের এর বেশি বজায় থাকলে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এই অনুপাত বজায় রাখার জন্য পানিতে বাহির থেকে কার্পোহাইড্রেট (যেমন-স্টার্চ, ময়দা, মোলাসেস, কাসাভা প্রভৃতি) সরবরাহ করা হয়। প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য ও উচ্চ ঘনত্বে মাছ থাকায় পুকুরে/ট্যাংকে ব্যাপক মাত্রায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এজন্য পর্যাপ্ত অ্যরেটর স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই প্রযুক্তিতে কোন পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। কারণ, এই প্রযুক্তিতে হেটারোট্রিপিক ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য গ্রহণ করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর করে। প্রোটিন হলো খাবারের সবচেয়ে দামী উপাদান। স্বাভাবিকভাবে খাবারের মাত্র ২৫% প্রোটিন মাছের দেহে কাজে লাগে। বাকী অংশ পানিতে অব্যবহৃত থেকে যায়। বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে এই অব্যবহৃত প্রোটিন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর হওয়ায় প্রোটিন রিকভারি দ্বিগুণ হয়ে যায়। বায়োফিল্টার পদ্ধতিতে নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াকে নিস্পাপ নাইট্রেটে রূপান্তর করে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বায়োফ্লক পদ্ধতিতে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া, নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়ার দশগুণ দ্রুতগতিতে অ্যামোনিয়া হ্রাস করে। ফলে এই পদ্ধতিতে পুকুরে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত থাকে ও উচ্চমূল্যের মৎস্য খাদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

কার্বন-নাইট্রোজেন সরবরাহের কল্পিত হিসাব ঃ

- ট্যাংকে মাছের মজুদ ঘনত্ব: ১০ কেজি/১০০০ লিটার ট্যাংকে
- প্রতিদিন মাছের ওজনের ১০% খাদ্য প্রয়োগ (খাদ্যের পরিমাণ: ১ কেজি)
- যদি ৩০% প্রোটিন যুক্ত খাবার হয়, তাহলে প্রোটিনের পরিমাণ: ৩০০ গ্রাম প্রোটিনে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে, সেক্ষেত্রে, প্রোটিনে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৪৮ গ্রাম
- মোট নাইট্রোজেনের ২৫% মাছের দেহে জমা হয়, বাকী ৭৫% নাইট্রোজেন পানিতে আসে। সুতরাং পানিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৩৬ গ্রাম।
- পানিতে কার্বন:নাইট্রোজেন ১৫:১ বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। অতএব প্রতিদিন জৈব কার্বন প্রয়োজন (১৫ * ৩৬) = ৫৪০ গ্রাম।
- জৈব পদার্থে ৫০% কার্বন থাকে। খাদ্যে মাটে কার্বনের ১৫% মাছে জমা হয়। প্রয়োগকৃত ১০০০ গ্রাম খাদ্য থেকে পানিতে কার্বন আসে = ৫০০ * ০.৮৫ = ৪২৫ গ্রাম বাহির থেকে প্রতিদিন কার্বন সরবরাহের প্রয়োজন = ৫৪০ - ৪২৫ = ১১৫ গ্রাম, যা ২৩০ গ্রাম ঘন মোলাসেস (চিটাগুড়) থেকে পাওয়া যায়। প্রয়োজন = ৫৪০ - ৪২৫ = ১১৫ গ্রাম, যা ২৩০ গ্রাম ঘন মোলাসেস (চিটাগুড়) থেকে পাওয়া যায়।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছচাষের সুবিধা ঃ

১. অনেক বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়। ফলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়।

২. এফসিআর কম, বিধায় খাদ্য খরচ কম হয়। খাদ্যের ক্রুড প্রোটিনের ৩৭% মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন পুকুরে ৩০% প্রোটিনসমৃদ্ধ দৈনিক ১০০ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করলে সেখানে দৈনিক ১১ কেজি মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. যেহেতু বিভিন্ন ধরণের উপকারী অণুজীব ব্যাপক মাত্রায় মাছের পুকুরে বিদ্যমান থাকে সেহেতু ক্ষতিকর রোগজীবাণু মাছকে আক্রমণ করতে পারে না।

৪. পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না বা খুবই স্বল্প পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে চাষ করা যায়। ফলে দূষণের মাত্রা একেবারেই কম।

৫. বায়োফ্লকে পানি পরিবর্তন না করে অ্যারেশান দেয়া হয় ফলে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

৬. ভূমি ও পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৭. সামুদ্রিক মাছকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে যেখানে ভূমির মূল্য কম বা অন্যান্য সুবিধা বিদ্যমান সেরকম স্থানে চাষ করা যায়।

৮. বায়োফ্লক ব্যবহার করে বাজারের নিকটবর্তী স্বল্প স্থানে খামার স্থাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা বছর মাছ / চিংড়ি সরবরাহ করা যায়।

৯. মাছচাষের বিভিন্ন ধাপে যেমন-নার্সারি, লালন ও পালন পর্যায়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

১০. অধিক জৈব নিরাপত্তা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ এ যাবত কোনো বায়োফ্লক প্রযুক্তির চিংড়ি খামারে হোয়াইট স্পট সিনড্রম দেখা যায়নি।

১১. অধিক পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় টেকসই পদ্ধতি।

বায়োফ্লক প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ঃ

১. বিদ্যুৎ খরচ বেশি। প্যাডেল হুইল লাগে ২৮ হর্সপাওয়ার/ হেক্টর।

২. নির-বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। এজন্য বিকল্প একাধিক ব্যাকআপ জেনারেটর রাখতে হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ এর বাণিজ্যিক হার কৃষির চেয়ে বেশি হওয়ায় খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।

৩. মাটির পুকুরের পাড়সহ তলা মোটা পলিথিন (এইচডিপিই) দিয়ে ঢেকে দিতে হয় ফলে উৎপাদন খরচ বেশি হয়।

৪. দক্ষ প্রশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন হয়।

বায়োফ্লক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা ঃ

বেশির ভাগ বাণিজ্যিক বায়োফ্লক চিংড়ি পুকুরের আয়তন ০.১ হতে ২.০ হেক্টর হয়ে থাকে, তেলাপিয়া/শিং মাছের পুকুরের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট ০.০১ হতে ০.২ হেক্টর হয়ে থাকে।

কনক্রিটের তৈরি ট্যাংকে অ্যারেটরগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমস্ত ট্যাংকের পানি সমভাবে মিশ্রিত হয় ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। বায়োফ্লকগুলো সর্বদা ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। কোনোভাবে যেন ট্যাংকের তলায় জমা না হয়। একজন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অ্যারেটরগুলো চালু রাখতে হবে। প্রাথমিকভাবে পানিতে মাছের খাদ্য ও পরিমাণমত কার্বোহাইড্রেট দিয়ে অ্যারেটর চালু করতে হবে। অতঃপর বায়োফ্লকের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বায়োফ্লক এর পমিাণ ১৫-২০ মিলি/ লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত হবে। চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ১৩০-১৫০ টি পিএল অবমুক্ত করা যাবে। নিয়মিত ৩০% প্রোটিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি কার্বন ও নাইটোজেনের অনুপাত কাঙ্খিত মাত্রায় রাখার জন্য বাইরে হতে জৈব কার্বন সরবরাহ করতে হবে। বায়োফ্লক এর পুকুরে অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, পিএইচ, বায়োফ্লক এর পরিমাণ ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উৎপাদন (Production) ঃ

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে তলায় পলিথিন বিছানো পুকুরে মাছচাষ করে প্রতি বর্গমিটারে প্রতি চাষে ১-২ কেজি (৪-৮ মে. টন/ একর) চিংড়ির উৎপাদন পাওয়া গেছে।

সিমেন্টের তৈরী ট্যাংকে চাষ করে প্রতি বর্গমিটারে ১০ কেজি পর্যন্ত চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তেলাপিয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রতি বর্গমিটারে ২০-৩০ কেজি (একরে ৮০-১২০ টন) পাওয়া গেছে।

শিং মাছ এর ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রতি বর্গমিটারে ২৫-৩৫ কেজি (একরে ৯০-১৩০ টন) পাওয়া গেছে।

বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- উপকারী ব্যাকটেরিয়ার উৎসঃ বায়োফ্লক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ন উপাদান উপকারী ব্যকটেরিয়া যা মাছচাষের ফলে উৎপাদিত বর্জ্যকে প্রোটিন সমৃদ্ধ জৈব খাবারে তৈরি করে। তাই সঠিক উৎস হতে প্রোবায়েটিক ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করতে হবে।
- নিয়মিত পানির গুনাগুন পরীক্ষা: নিয়মিত ট্যাংকে সরবরাহকৃত পানির গুনাগুন যেমন-অ্যামেনিয়া, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ফ্লকের ঘনত্ব ইত্যাদি পরিমাট করতে হবে এবং এগুলো যদি সঠিক মাত্রায় না থাকে তাহলে প্রয়োজণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি: পর্যাপ্ত ফ্লকের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াজণীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবল: বায়োফ্লকের মাধ্যমে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন।
- সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ: সর্বোচ্চ এক ঘন্টা ট্যাংকে অক্সিজেন সরবরাহ না করা হলে সব মাছ মারা যেতে পারে। তাই বিদ্যুৎ সংযোগের পাশেপাশি আইপিএস কিংবা জেনারেটরের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ঃ

ক্রমিক নং	উপকরণ/যন্ত্রপাতি	প্রয়োজনীয়তা	মন্তব্য
০১	ট্যাংকে থার্মষ্ট্যাট স্থাপন	শীতের সময় ট্যাংকের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধির	পানির তাপমাত্র ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিজে নামলে ফ্লক নষ্ট হয়ে যেতে পারে
০২	পিএইচ মিটার	পানির পিএইচ নির্ণয়ের জন্য	বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছচাষ করার জন্য পানির পিএইচ এর মান ৭.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো হবে।
০৩	অ্যামোনিয়া টেস্টিং কিট	৩-৪ দিন অন্তর অন্তর ট্যাংকে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে।	অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ০.৫ মি.গ্রাম/লি. এর নিচে রাখতে হবে।
০৪	থার্মোমিটার	সবসময় একটি থার্মোমিটার ট্যাংকের পানিতে রাখতে হবে	পানির তাপমাত্র ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামলে ফ্লক নষ্ট হয়ে যেতে পারে
০৫	ডিও মিটার	ডিও মিটার (Dissolved Oxygen Meter) এর সাহায্যে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।	পানির তাপমাত্র ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামলে ফ্লক নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
০৬	স্যালাইনিটি মিটার	বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে অতি অল্প মাত্রার স্যালাইটিও পরিমাপ করতে হবে।	লবণাক্ততার পরিমাণ ১.২ থেকে ১.৫ পিপিটি এর মধ্যে থাকতে হবে। পোনা ছাড়ার সময় ০.৭ পিপিটি থাকবে হবে।
০৭	র-সল্ট	প্রতি টন পানিতে ৫০০ গ্রাম হারে র-সল্ট করতে হবে।	আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রয়োগ করলে ফ্লকের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়।
০৮	মোলাসেস/চিটাগুড়	বায়োফ্লক ট্যাংকের কার্বনের উৎস হিসাবে সাধারণত মোলাসেস বা চিটাগুড় ব্যবহার করা হয়।	শুকনো চিটাগুড়ে প্রায় ৪৫%-৫০% কার্বন পাওয়া যায়
০৯	চুন	প্রতি টন পানিতে ১০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।	চুন ব্যবহারের ক্ষেত্রে caCO3 তথা পাথুর চুন ব্যবহার করা উত্তর

প্রযুক্তির নাম: বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে শিং মাছ চাষ		মন্তব্য
ট্যাংকের আয়তন	৫০০০ লিটার	প্রতিটি ট্যাংক ১৫০০০ লিটার হলে অধিক লাভজনক হতে পারে
চাষকৃত মাছের প্রজাতি	শিং মাছ	পরীক্ষামূলক তেলাপিয়া বা চিংড়ি চাষ করা যেতে পারে
মজুদ ঘনত্ব/ঘন মিটারে	৬০০ টি	প্রতি ঘন মিটারে সর্বোচ্চ ১০০০টি দেওয়া যেতে পারে
মজুদকালীন মাছের ওজর	৯.০৯ গ্রাম (প্রতিটির গড় ওজন)	
প্রোবায়োটিক (পন্ড কেয়ার)	১০ গ্রাম/১০০০ লিটার পানিতে	৫ গ্রাম/১০০০ লিটার পানিতে যথেষ্ট
মাছের মৃতের হার	১২.৩৯%	প্রথম ২ সপ্তাহে শিং মাছের ঘাড়ে, লেজে এবং পেটের দিকে ক্ষত [সাদা দাঘ] হয়ে ১২.৩০% মাছ মারা গিয়াছে
উৎপাদন	১৩০ কেজি	প্রতিটির গড় ওজন ৫২.৫৫
ব্যয়		
আইপিএস	খামারের বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় আইপিএস সেবা পাওয়া যাচ্ছে	বর্ণিত আইপিএস দিয়ে ১৫০০০ লিটারের ১০টি ইউনিটে দৈনিক গড়ে ৫ ঘন্টা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া যায়
অ্যারেটর (৩৫ ওয়াট) [এয়ারস্টোন ও পাইপসহ]	৩৫০০/-	১৫০০০ লিটার ট্যাংকে ১০০ ওয়াটের অ্যারটের যথেষ্ট
চুন, লবন ও পটাশিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট	২৫০/-	
মোলাসেস+চিনি	১০০০/-	যখন পানির ঘনত্ব বেশি হতো তখন মোলাসেসের পরিরর্তে চিনি ব্যবহার করা হয়েছিল
পোনা মাছ ও খাদ্য	১৩০০০/-	গবেষণাকালীন মসয়ে তাপমাত্রা অনেক কম ছিল তাই মাছ খাদ্য গ্রহণ কম করেছে
প্রোবায়োটিক	১০০০/-	পন্ডকেয়ার নামক প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা হয়েছিল

ঔষধ [অ্যাকোয়া সলভ, ভিটামিন-সি]	১২০০/-	৮০% বেনাজালকোনিয়াম ক্লোরাইড প্রতি ঘন মিটারে ২ মি.লি হিসেবে মাছের ক্ষতরোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে
অ্যামোনিয়া টেস্টিং কিট	২০০০/-	২০০০ টাকা দামের টেস্টিং কিট দিয়ে ২৭০ বার অ্যামোনিয়া পরীক্ষা করা যাবে
পি.এইচ মিটার ও টিডিএস মিটার	৫০০০/-	
অন্যান্য	৩০০০/-	
মোট খরচ	২৩৯৫০	কিছু খরচ এককালীন বিধায় পরবর্তী চাষের ক্ষেত্রে খরচ অনেকাংশেই কমে যাবে
মাছ বিক্রয়	৩৭০০০/-	
নীট লাভ	১০০৫০/-	

বায়োফ্লক প্রযুক্তি একটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতি। পানি পরিবর্তন করতে হয় না বিধায় এই পদ্ধতি পানি সাশ্রয়ী এবং এতে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পুকুর বা ট্যাংকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হয় বিধায় এই পদ্ধতি পবিবেশবান্ধব। তাছাড়া বর্জ্য থেকে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হয় বলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করেই কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায়। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির চেয়ে এতে উৎপাদনও অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে যেহেতু ভূমি ও পানির সংকট রয়েছে, সেহেতু এই পদ্ধতিতে মাছচাষ খুবই উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। কৃষির মতো মৎস্যখাতে সুলভে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা গেলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। অতএব একটি টেকসই লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হিসেবে বায়োফ্লক প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মৎস্যচাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

অধিশেন - ৬

পাবসস এর খালে খাঁচায় তেলাপিয়া মাছের চাষ

খাঁচায় মাছ চাষের সুবিধা ঃ

- খাঁচায় মাছচাষের মাধ্যমে অব্যবহৃত/অপ্রচলিত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নদী তীরবর্তী, হাওর, বাঁওড়, বিল এলাকার জনগণের অংশগ্রহণে খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।
- পুকুরের চেয়ে খাঁচায় অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়।
- মাছের খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং মাছের পরিচর্যা সহজে করা যায়।
- প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।
- খাঁচায় মাছচাষে মাছ আহরণে তেমন কোন খরচ হয় না এবং বাজার দর বুঝে যে কোন সময় ইচ্ছেমত মাছ ধরা যায়।
- নদীতে মাছ ধরার চাপ কমাতে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে খাঁচায় মাছচাষ।

খাচায় মাছচাষ অব্যবহৃত/অপ্রচলিত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

খাঁচার প্রকারভেদঃ দেশে-বিদেশে মাছচাষে যে সব খাঁচা ব্যবহৃত হয় তা মূলত দুই প্রকারের

১. স্থির খাঁচা (Fixed Cages) ২. ভাসমান খাঁচা (Floating Cages)

মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

জলাশয় ও স্থান নির্বাচন ঃ

নিম্মোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে জলাশয় ও স্থান নির্বাচন করতে হবে ঃ

- খাঁচা স্থাপনের জন্য জলাশয় হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম স্রোতের ছাটে নদী বা বড় নদীর অংশবিশেষ যেখানে একমুখী প্রবাহ কিংবা জোয়ার ভাটার প্রবাহ বিদ্যমান, বড় ও প্রশস্ত খাল, সেচ প্রকল্পের খাল, প্লাবনভূমির গভীর পানির এলাকা, গভীর বিল ও বাওড়কে জলাশয় হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।
- মূল খাঁচাটি এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেখানে সারা বছর পর্যাপ্ত পানি থাকে। খাচার তলদেশ নিচের কাঁদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক। পরিষ্কার পানির জলাশয় খাঁচা স্থাপনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা উত্তম।
- খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনভাবেই নৌ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এমন স্থান হতে হবে।
- সর্বোপরি খাঁচা স্থাপনের জায়গাটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়:নিষ্কাশনের পানি অথবা কৃষিজমি
- থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাঁচার মাছ মেরে ফেলতে না পারে।

খাঁচা তৈরি ঃ

খাঁচা তৈরিতে নানাবিধ উপকরণের প্রয়োজন হয়। কোন ধরণের খাঁচা তৈরি হবে তার ওপর নির্ভর করে খাঁচার উপকরণের তারতম্য হতে পারে। সাধারণত খাচা তৈরিতে তিন ধরনের উপকরণ লাগে: **১.** খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ, ২. খাঁচার কাঠামো তৈরির উপকরণ এবং ৩. খাচা পরিচালনার জন্য উপকরণ।

মাছ চাষ ম্যানুয়াল ঃ

১। খাঁচার জাল তৈরির উপকরণ ঃ

- পলিইথিলিন জাল (ঘের জাল): ৬ তার বিশিষ্ট, রাসেল নেট (খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরীতে)।
- মরক্কো কাছি (২৪ তার বিশিষ্ট), গ্রীন হেংস চিকন রশি (২৪ তার বিশিষ্ট)।
- গ্রীন হেংস চিকন সুতা (মেরামতের জন্য), কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখি, ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)।

২। ফ্রেম তৈরির উপকরণ ঃ

- ১" জি.আই. পাইপ (৭০ ফুট প্রতিটি খাচার জন্য)। জিআই পাইপ এর পরিবর্তে বাঁশ দিয়েও খাঁচার ফ্রেম তৈরী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাঁচার স্থায়িত্ব কম হবে।
- ঝালাই করার জন্য ওয়েলডিং রড ও ফ্লাটবার।
- ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য শূন্য ব্যারেল/ড্রাম (২০০ লিটারের পি.ভি.সি. ড্রাম, ওজন ৯ কেজির উর্ধ্বে)।
- খাঁচা স্থির রাখার জন্য গেরাপি (Anchor),
- গেরাপি বাঁধতে মোটা কাছি (১২ নং গ্রীন হেংস)।
- ফ্রেমের সাথে বাধার জন্য মাঝারী আকারের সোজা বাঁশ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)।

৩। খাঁচা ব্যবস্থাপনার জন্য উপকরণ ঃ

- খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য রাখার জন্য ছোট টিনশেড ঘর ও খাদ্য প্রদান নিয়মিত পরিচর্যার জন্য নৌকা।
- মাছ বাছাই (ঝড়ৎঃরহম) ও স্থানান্তরের জন্য সুবিধাজনক পাত্র (বড় পাতিল কিংবা কাটা ড্রাম)।
- খাদ্য প্রদানের জন্য সুবিধাজনক পাত্র ও খাচা পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ।
- মাছের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য (ফরমালিন, কপার সালফেট, ইত্যাদি) ও ঔষধ।
- মাছ আহরণের জন্য হাতল বিশিষ্ট থলে জাল ও মাছ পরিবহনের জন্য বাঁশের ঝুড়ি/খাড়ি/প্লাষ্টিকের ঝুড়ি।
- মাছ মাপার জন্য ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ব্যালেন্স/দাঁড়িপাল্লা।

পুকুরের জন্য ১ ঘনমিটার আকারের খাঁচাই উপযোগী।

খাঁচার ফ্রেম তৈরি ঃ

ফ্রেমের কাঠামো নির্ভর করবে কোন পরিবেশে খাঁচা স্থাপন করা হবে তার ওপর। পুকুরের পরিবেশে যেখানে পানির কোন স্রোত বা প্রবাহ নেই সেখানে পিভিসি পাইপ, বাঁশ, ইত্যাদি দিয়ে ফ্রেম তৈরি করলেও চলবে। কিন্তু যেখানে স্রোত বা বিভিন্ন মাত্রার প্রবাহ বিদ্যমান সেখানে খাঁচার ফ্রেম অবশ্যই মজবুত ও শক্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত খাঁচার ফ্রেম তৈরি করতে প্রথমে ১ ইঞ্চি জি আই পাইপ দ্বারা ২ ফুট ী ১০*৪ ফুট ফ্রেম তৈরি করা হয়। একটি ফ্রেম তৈরিতে ৭০ ফুট পাইপ ব্যবহৃত হয়।

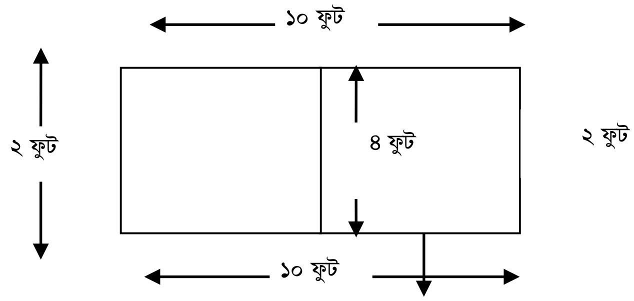

আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরি করা হয়। এতে সরাসরি ২ ফুট ১০ ফুট আকারের খাঁচা বসানাে যায় আবার প্রয়াজেনবোধে ১০ ফুট ী ১০ ফুট খাঁচাও বসানো যাবে। এভাবে ফ্রেমগুলো তৈরি করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করে খাচার আকারে সাজিয়ে ইউনিট তৈরি করা হয়। একটি ফ্রেমের সাথে অন্যটি সাজানারে জন্য এবং সেগুলো পানিতে ভাসমান রাখার জন্য দুইটি ফ্রেমের মাঝে ৩টি ডাম বসানো হয়। দুই ফ্রেমের মাঝে ডাম দিয়ে ফ্রেম দুটোকে ১৭-১৮ ফুট দৈর্ঘ্যের রড দিয়ে (দুই মাথায় ক্লাম্প তেরি করে) সংযুক্ত করা হয়। আবার ডামের উপরে বসানোর মতো ৩ সুতা রডের ফ্রেম তৈরী করেও রডের ফ্রেমের সাথে জিআই পাইপের মূল খাচার ফ্রেম বেধে দেয়া যাবে।

পুকুরে খাচা স্থাপন ঃ

জলাশয়ে পোঁতা বাঁশের সাথে বেঁধে সাধারণত ভাসমান খাঁচার অবস্থান রক্ষা করা যায়। ভাসমান খাঁচা পানির উপরিস্তর উঠানামার সাথে সাথে উঠানামা করতে পারে। কেননা খাঁচাটি জলাশয়ে এমনভাবে পোঁতা বাঁশের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় যাতে পানির ওঠা-নামার সাথে সুবিধা না হয়। অনেক সময় দুই পাশে দুটি বাশ পুঁতে মাঝখানে একটি বাশ বেঁধে ঐ বাঁশের সাথে দড়ি বেঁধেও খাঁচা স্থাপন করা যায়। খাঁচার দুই-তৃতীয়াংশ অথবা তিন-চতুর্থাংশ পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে।

খাঁচা স্থাপনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান (গভীরতা, জলাশয়ের স্থান), খাঁচা স্থাপন পদ্ধতি (একক/সারিবদ্ধ);
- খাঁচা হতে খাঁচার দুরত্ব (কমপক্ষে ১ মিটার), খাঁচা স্থাপনের সময় (পানো মজুদের ১০-১৫ দিন পূর্বে);
- কাকড়ার নাগালের বাইরে রাখা (খুঁটির গাড়োয় ব্যবহৃত পানির বাতেলের ফানেল অথবা পাটের দড়ি পেঁচিয়ে দিয়ে);
- পানির উপরে খাঁচার উচ্চতা (৬-১২ ইঞ্চি), ফ্লোট বাঁধা (পানির ৯ ইঞ্চি নীচে)।

জলাশয়ে খাচা স্থাপনের পূর্বে খাচার ফ্রেম অবশ্যই মজবুত ও শক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং

সেক্ষেত্রে দীর্য মেয়াদী প্রকল্পে জিআই পাইপের ফ্রেম ব্যবহার করা উচিত।

মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ঃ

আঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি

সাধারণভাবে খাঁচায় চাষের জন্য মৎস্য প্রজাতিগুলোর নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয় ঃ

* স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধি হার বেশি।	* স্থানীয় বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশি;
* সহজে পোনা পাওয়া যায়;	* বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত আমিষ সমৃদ্ধ পিলেট খাদ্য প্রয়োগে চাষ করা যায়
*রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি;	* কম সময়ে বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়;
*খাচার পরিবেশ ও পানির গুণাগুণ পরিবর্তনের ধকল সহ্য করতে পারে;	* সুস্বাদু, পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় চেহারার;
* অধিক ঘনত্বে বসবাস উপযোগী।	*নদীর প্রবাহমান পানির খাচায় মাছের লাফানারে প্রবণতা কম হয়

উল্লেখ্য, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়ার খাঁচায় চাষ সর্বাধিক লাভজনক ও সুবিধাজনক বিবেচিত হয়েছে। সে কারণে খাচায় তেলাপিয়া মাছের চাষ আলোচিত হলো। নার্সারি পুকুর থেকে পানো পরিবহন ও খাঁচায় মজুদ খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারি হতে পানো পরিবহন ও খাঁচায় পোনা মজুদকরণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পলিথিন ব্যাগে অথবা ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে পানো পরিবহন করা যায়। পোনা পরিবহন ও মজুদকরণ ব্যবস্থাপনা সাধারণ চাষ ব্যস্থাপনার অনুরুপ যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। খাঁচায় তেলাপিয়ার পোনা পরিবহনের জন্য নার্সারি হতে পানো সংগ্রহের পূর্বে নিম্লোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে:

মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ ঃ

খাঁচায়মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। স্বল্প আয়তনে প্রত্যাশিত উৎপাদন পেতে হলে মজুদ ঘনত্ব যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। তবে এ ঘনত্ব বাড়ানোর সাথে বেশ কিছু বিষয় জড়িত যা নিম্মে উল্লেখ করা হল:

১) জালের ফাঁসের আকার ঃ

খাচায় ব্যবহৃত জালের ধরনের ওপর মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হয় এবং উৎপাদনও কমবেশি হয়। জালের ফাঁসের আকার বড় হলে ঐ খাঁচায়। মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। কারণ জালের ফাসের আকার (গবংয ঝরুব) বড় হলে পানির প্রবাহ বেশি হবে এবং অক্সিজেনের পরিমাণও বেড়ে যাবে। অন্য দিকে জালের ফাঁসের আকার ছোট হলে স্রোতের প্রবাহ কম হয়, ফলে অক্সিজেন সঞ্চালন কম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পোনা মজুদ ঘনত্ব খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। খাঁচায় জালের ফাঁসের আকার ০.৭৫ ইঞ্চি হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে ৩৩টি পানো মজুদ করা যায়।

২) পানির গভীরতা ঃ

খাঁচা স্থাপনে পানির গভীরতা একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খাঁচা স্থাপনের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হয়, সেখানে যদি খাড়ি অঞ্চল থাকে অথবা পানির গভীরতা বেশি হয় তবে মাছ চাষে সুবিধা হয় এবং মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো সম্ভব হয়।

৩) উৎপাদিত মাছের আকার খাঁচায় মাছ চাষের একটি সুবিধাজনক দিক হলো প্রত্যাশা অনুযায়ী যে কোনো আকারের মাছ উৎপাদন করা যায়। বাজারে কত ওজনের মাছের চাহিদা রয়েছে সেদিক বিবেচনায় রাখতে হবে এবং তার ওপর ভিত্তি করে মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করে মাছ চাষ করতে হবে। যদি ১ ঘন মিটারে ৩৩টি মাছ মজুদ করা যায় তাহলে ৬ মাসে গড়ে ৫০০ গ্রাম ওজনের তেলাপিয়া পাওয়া যাবে। যদি ৩০০ গ্রাম ওজনের মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাহিদা থাকে এবং ঐ পরিমান লাভ পাওয়ার টার্গেট থাকে তবে প্রতি ঘন মিটারে ৪০-৫০টি মাছ মজুদ করতে হবে।

৪) খাদ্যের গুণগতমান ঃ

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগতমান মাছের উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখে। খাঁচায় মাছচাষের জন্য সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। যদি খাদ্যের গুণগতমান ভাল হয় তাহলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া খাদ্যের গুণগতমানের ওপর ভিত্তি করে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। যদি খাদ্যের গুণগতমান ভাল হয় তাহলে মাছের মজুদ ঘনত্ব বাড়ানো যাবে এবং মাছের উৎপাদনও বেড়ে যাবে।

এছাড়া বিনিয়োগের আর্থিক সংগতির ওপর মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে।

পুকুর/দিঘী/বিল (প্রতি ৮০০ বর্গ ফুট আকারের খাঁচায় মজুদ সংখ্যা) ৮০০-১০০০

খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ঃ

লাভজনকভাবে খাঁচায় মাছচাষের জন্য খাদ্য নির্বাচন ও প্রয়োগ অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। খাঁচায় তেলাপিয়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যে শতকরা ২৮-৩০% আমিষ থাকা উত্তম। ফিড মিলে উৎপাদিত পিলেট এবং স্থানীয়ভাবে তৈরী খাদ্য উভয়ই খাঁচায় ব্যবহার করা যায়। অপচয় কমিয়ে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে ভাসমান পিলেট জাতীয় খাদ্য বেশী উপযোগী। নার্সারি অবস্থায় মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পানোর দেহ ওজনের ১৫% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। চাষকালীন প্রথম দুই মাস ৮-১০% এবং শেষ দুই মাস ৫-৬% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

নমুনায়ন ও গ্রেডিং ঃ

নমুনায়ন ঃ

খাঁচায় মাছচাষের ক্ষেত্রে নমুনায়ন করা হয় মাছের দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, খাঁচার জাল, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য। এজন্য মাঝে মাঝে নির্ধারিত বিরতিতে প্রতিটি খাঁচার নীচে আড়াআড়িভাবে বাঁশ দিয়ে টেনে মাছগুলোকে খাঁচার একপার্শ্বে জড়ো করে মাছের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। মাছের গড় ওজন বের করার জন্য জড়াে করা মাছের ১০% এর ওজন মেপে দেখতে হবে।

খাঁচার মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ

আরহণযোগ্য মাছের আকার, ওজন, বাজার চাহিদা, চাষের মেয়াদ ও ব্যবস্থাপনার ধরন বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খাঁচার সব মাছ একত্রে বাজারজাতের উপযোগী আকার হয় না। তাই বড় মাছগুলো বাছাই করে বাজারে প্রেরণের জন্য পৃথক এক বা একাধিক খাঁচায় রাখতে হবে। এতে একদিকে যেমন একই আকারের মাছ গ্রেড করার কারণে উপযুক্ত মূল্য ও অন্যদিকে ধীরে ধীরে ছাটে মাছগুলো বড় হওয়ার জন্য অতিরিক্ত স্থান ও সময় পাবে। মাছ বাজারে প্রেরণের সময় ভর্তি থাকে তবে তা মাছের গুণগতমান নষ্ট হওয়াকে তরান্বিত করে। এজন্য মাছ বাজারে প্রেরণের আগের দিন ঐ খাঁচায় দুপুরের পর খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। এতে বাজারজাতের জন্য প্রেরিত মাছের গুণগতমান অধিক সময় অক্ষুন্ন থাকবে।

নিয়মিত পরিচর্যা ঃ

খাঁচায় মাছচাষের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়মিত খাঁচা ব্যবস্থাপনার উপর। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাঁচায় মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১. নিয়মিত খাবার প্রয়োগ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত উৎপাদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ গুণগত মানসম্পন্ন দানাদার ভাসমান খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

২. আচরণ পর্যবেক্ষণ: মাছের আচরণের যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকা। মাছ যদি অস্বাভাবিকভাবে ভেসে বেড়ায় কিংবা যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ না করে অথবা অন্য যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. জাল পর্যবেক্ষণ: জালে ছিদ্র আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা (সকাল বেলা খাওয়ানারে পূর্বে জাল পরীক্ষা করার উত্তম সময়)। জালে ছিদ্র থাকলে বা কোন কারণে ছিড়ে গেলে তা মেরামত কিংবা নতুন খাঁচা স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. মৃত মাছ অপসারণ: খাঁচার ভিতরে যদি কোন মাছ মারা যায় তবে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে করে পরিবেশ দূষণ না হয়।

৫. ক্ষতিকর প্রাণীর আক্রমণ: ক্ষতিকর প্রাণী যেমন: কাঁকড়া, গুইসাপ, সাপ, ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষা করা।

৬. উচ্ছিষ্ট খাদ্য সরবরাহকৃত খাবার অনেক সময় সম্পূর্ণ রুপে না খেলে তা জমা হয়ে খাঁচার স্বাভাবিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য উচ্ছিষ্ট বা অতিরিক্ত খাবার দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭. জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান পর্যবেক্ষণ: জোয়ার ভাটার সময় পানির উঠানামার সাথে সাথে খাঁচার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. খাঁচার জালের ফাঁস বন্ধ হয়ে যাওয়া: শ্যাওলা দ্বারা জালের ফাঁস বা মেস বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ কমে যায়। লম্বা হাতলযুক্ত নরম ব্রাশের সাহায্যে জালের শ্যাওলা পরিষ্কার করতে হবে। আবার মাছকে ২/১ দিন খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখলে মাছ এই শ্যাওলা খেয়ে জাল পরিস্কার করে ফেলে।

৯. খাঁচার অভ্যন্তরে বা দুই খাঁচার মাঝে আবদ্ধ আবর্জনা: খাঁচার মধ্যে অনেক সময় ছাটে ছাটে কচুরীপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ঢুকেযায়। এগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

১০. প্রাকৃতিক বিপর্যয়: বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন ঝড়, জলোচ্ছাস, ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষার জন্য পূর্ব সতর্কতা হিসাবে খাঁচা ওঠা-নামা রশি ঢিলা, শক্ত নোঙ্গর, ইত্যাদি সতর্ক অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

১১. পাখির উপদ্রব: খাঁচার উপর ঢাকনা জাল দেয়া যাতে বক, পানকৌড়ি, ইত্যাদি পাখি খাবারের জন্য এসে মাছকে ঠুকরিয়ে আঘাত করতে না পারে।

১২. ড্রাম ভাসমান রাখা ড্রাম ছিদ্র হয়ে গেলে ড্রাম ডুবে গিয়ে জাল ডুবে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। ঝালাই দেয়ার সুবিধা থাকলে ঝালাই দিয়ে পুনরায় ড্রাম স্থাপন করতে হবে।

১৩. পানির গুণগতমান পর্যবেক্ষণঃ পুকুরে স্থাপিত খাঁচার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পুকুরের পানি যাতে অত্যধিক সবুজ হয়, বাঁশে শ্যাওলা জমে যেন পচে না যায়।

খাঁচায় মাছচাষের আয়-ব্যয়, মুনাফা হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

১ টি খাঁচার ১টি ইউনিট স্থাপনের সম্ভাব্য খরচ ঃ

ক্র: নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
	রেডিমেড জাল	১ টি	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০
১	ড্রাম/ব্যারেল	২ টি	১৫০০.০০	৩০০০.০০
২	১ ইঞ্চি জিআই পাইপ	৭৫ ফুট	৮৫.০০	৬৩৭৫.০০
৩	ফ্রেমের সংযোগ লৌহ	৬.৬ টি	১০০.০০	৬৬০.০০
৪	গেরাপী	১টি (২০ কেজি প্রতিটি)	২৫০০.০০	২৫০০.০০
৫	গেরাপী বাঁধার কাছি	১ কয়েল	৫০০.০০	৫০০.০০
৬	বাঁশ	২ টি	২০০.০০	৪০০.০০
৭	নাইলনের সুতা ও রশি	থোক		৫০০.০০
৮	শ্রমিক মজুরী	থোক		৫০০.০০
৯	অন্যান্য	থোক		৫০০.০০
১০		১ টি খাঁচা স্থাপনে মোট খরচ		১৮,৪৭৫.০০

১ টি খাঁচার এক ফসলের (৬ মাস) উৎপাদন খরচ ঃ

ক্র: নং	উপকরণের নাম	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১	মাছের পোনা সংগ্রহ (প্রতিটি গড়ে ৩০ গ্রাম)	৮০০টি	২.০০	১৬০০.০০
২	মাছের খাদ্য	৪০০ কেজি	৫৫.০০	২২০০০.০০
৩	শ্রমিক মজুরী	১ জন (৬ শ্রম মাস)	১৫০০.০০	৯০০০.০০
৪	অন্যান্য (স্থাপনা ব্যয়সহ)			১০০০.০০
			মোট:	৩৩৬০০.০০

একটি খাঁচায় একটি ফসলে উৎপাদন= ৪০০ কেজি
প্রতি কেজি মাছের পাইকারী বাজারমূল্য =১১০ টাকা
মোট মাছ বিক্রয় = ৪৪০০০.০০ টাকা
বছরে ২ ফসল হিসাবে ১টি খাঁচায় মোট আয় ৪৪,০০০.০০*২=৮৮০০০.০০ টাকা
খাচা বানানো খরচ বাদে ২ টি ফসলে ব্যয় ৩৩,৬০০.০০*২= ৬৭,২০০.০০ টাকা
লাভ = (৮৮০০০.০০ -৬৭,২০০.০০)= ২১,৮০০ টাকা
*গড়ে প্রতিটি খাঁচায় আয়ুষ্কাল ৫ বছর ধরে ফসল প্রতি স্থাপনা ব্যয় ধরা হয়েছে,
সেক্ষেত্রে ৫ বছরে মোট আয় ৪,৪০,০০০.০০ টাকা
৫ বছরে মোট ব্যয় ১,৮৬,০০০.০০ টাকা
৫ বছরে নীট লাভ = (৪,৪৪,০০০.০০ -১,৮৬,০০০.০০)= ২,৫৮,০০০ টাকা

খাঁচায় মাছচাষের মাধ্যমে অব্যবহৃত/অপ্রচলিত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় এবং গুনগতমান সম্পন্ন ভাসমান পিলেট খাদ্য ব্যবহার করলে খাদ্যের অপচয় কমিয়ে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায়।

অধিবেশন - ৭

পাবসস এর খালে ছোট ছোট বাক্সে / জলাশয়ের ডিচ বা গর্তে কুচিয়ার চাষ

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবার ভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হতে পারে ।

কুচিয়া চাষে স্বাবলম্বী নারী

কুচিয়া এক ধরনের মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট পিচ্ছিল ও আইশবিহীন, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ। মাছটির বৈজ্ঞানিক নাম Monopterus cuchia। দেশে আদিবাসী জনগাষ্ঠৗ এবং সনাতন ধর্মাম্বলীর লোকজনের নিকট কুচিয়া অধিক জনপ্রিয়। এক সময় দেশের সর্বত্র কুচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে নির্বিচারে অতি আহরণ করার ফলে কুচিয়ার পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। তাই কুচিয়া চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই পাবসস এর নারী সদস্যগণ বাড়ির আঙ্গিনার জলাশয়ে ছোট ছোট খাচ সেট কওে তাতে কুচিয়ার চাষ করতে পারেন এবং লাভবান হতে পারেন।

কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ ঃ

১. কুচিয়া কষ্টসহিষ্ণু মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা, ডিচে চাষ করা যায়।

২. কম অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা জলাশয়ের প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে।

৩. জীবিত অবস্থায় কুচিয়া বাজারজাত করা যায়।

৪. কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে।

৫. গ্রামীণ মহিলারা সহজেই পুকুর/হাপা/চৌবাচ্চা/ডিচে (গর্ত)/বাক্সে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

কুচিয়ার খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

১. কুচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার।

২. এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়।

৪. ১০০ গ্রাম কুচিয়া থেকে প্রায় ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় যেখানে অন্যান্য সাধারণ মাছ হতে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি।

সদস্য পর্যায়ে কুচিয়া চাষে করণীয়সমূহ ঃ

ক) কুচিয়ার আবাসস্থল (ডিচ) নির্মাণ

১) ২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট প্রস্থ ও ৪ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট একটি ডিচ নির্মাণ করতে হবে। ডিচের আয়তন অনুযায়ী ডিচের সমপরিমান সাইজের পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ত্রিপল বিছিয়ে দিতে হবে।

২) তলদেশের ১ম স্থর ১০ সেমি ঘনত্বে কাঁদা মাটি (এটেল মাটি ৮০% ও দোআঁশ মাটির ২০% মিশ্রণ), ২য় স্থর ১০ সেমি ঘনত্বে চুন, গাবের, কচুরীপানা ও খর মিশ্রিত কম্পোষ্ট, ৩য় স্থর ২-৩ সেমি ঘনত্বে ৭ দিনের শুকনো কলাপাতা এবং উপরের ৪র্থ বা শেষ স্থর ১০ সেমি ঘনত্বে কাঁদা মাটি (এটেল মাটি ৮০% ও দোআঁশ মাটির ২০% মিশ্রণ) স্থর সাজাতে হবে।

৩) ডিচের ভিতরের চারদিক ৪০-৫০ সেমি চওড়া ৮০% এটেল মাটি দিয়ে একটি পাড়/বকচর নির্মাণ করতে হবে।

৪) নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং তাপমাত্রা রোধ করার জন্য পাড়ের উপর নারিকেল/তাল গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেন পাড়টি সহজে গরম না হয়। পাড়টি যেন পানির স্থর থেকে সবসময় বেশী উচ্চতায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) প্রস্তুতকৃত ডিচে তেলাপিয়া বা কচ্ছপ মাছের ধানী পোনা ছেড়ে দিয়ে তা কমপক্ষে ২-৪ দিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মাছের পোনা জীবিত থাকলে বুঝতে হবে, ডিচটি কুচিয়া চাষের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

৬) ধানক্ষেত যেমন কুচিয়ার আবাসস্থল ঠিক তেমনিভাবে ডিচের পরিবেশটাও ধানক্ষেতের মত যেন বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭) বর্ণিত আকারের ডিচে ৫০০-৭৫০টি কুচিয়া (১৫০-২৫০ গ্রাম ওজনের কুচিয়া) মজুদ করা যেতে পারে। কুচিয়া মজুদে পুরুষ এবং স্ত্রী কুচিয়ার অনুপাত হবে ১ঃ২।

৮) কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে ৪০-৬০ টি (৫০-৮০ গ্রাম ওজনের) কুচিয়ার। পোনা মজুদে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

খ) পুরুষ এবং স্ত্রী কুচিয়া চেনার উপায় ঃ

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য	পুরুষ কুচিয়া	স্ত্রী কুচিয়া
পেট	গোলাকার, অপেক্ষকৃত শক্ত	নরম ও গোলাকার
পায়ুপথ	সামান্য লম্বা ও লালচে বর্ণের	পায়ু পথ স্ফীত, গোলাকার, মাংসল ও গোলাপী
লেজ	ছোট	চ্যাপ্টা
রং	শরীরের উজ্জ্বল ও বাদামী	শরীরের রং তুলনামূলক ফ্যাকাশে

গ) কুচিয়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

পরিপক্ক কুচিয়া সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। তবে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস মুখ্য প্রজননকাল। প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য নির্মিত ডিচের বকচরে কুচিয়া বিশেষ ধরনের গর্তবিশেষ আবাসস্থল তৈরি করে। গর্তে স্ত্রী কুচিয়া ডিম দেয় এবং পুরুষ। কুচিয়ার স্পার্ম দ্বারা তা নিষিক্ত হয়। ডিচে কুচিয়ার পোনা দেখা গেলে তা তুলে অন্য নার্সারী ডিচে স্থানান্তর করতে হবে। কেননা ডিচে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে পুরুষ কুচিয়া পোনাগুলোকে খেয়ে ফেলতে পারে।

ঘ) কুচিয়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

১. ছোট মাছ, মাছের পোনা, গুতুম মাছ, কেঁচো, শামুক, সিল্ক ওয়ার্ম পিউপা, জলজ কীটপতঙ্গ, শুটকী মাছ, এ্যাপেল শামুক ইত্যাদি কুচিয়া বেশী খেতে পছন্দ করে।

২. এক ধরনের লাল কেচো কুচিয়া পছন্দের খাবার। তাই কুচিয়ার ডিচের পার্শে ভার্মি কম্পাষ্টে প্লান্ট স্থাপন করে দিতে হবে যাতে পর্যাপ্ত কেচোঁর সররাহ নিশ্চিত করা যায়।

৩. জীবন্ত খাবার হিসেবে কার্প মাছের রেণু বা ধানী পোনা ১৫ দিন পর পর মজুদ করতে হবে। আবার তেলাপিয়া মাছ মজুদ করা হলে তেলাপিয়া পোনা উৎপাদন করবে যা কুচিয়ার খাবার হিসেবে ব্যবহার হবে।

৪. কুচিয়া মাছ নিশাচর প্রাণী হওয়ায় রাতে খাবার খায়।

৫. ডিচে ফিশমিল ও অন্যান্য আমিষের উৎসের খাদ্য উপকরণ দিয়ে ৪০% আমিষ যুক্ত পিলেট খাদ্য তৈরি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. প্রতিদিন দেহ ওজনের ৩-৫% সম্পূরক খাবার দিতে হবে। কুচিয়া চাষকালে ছোট অবস্থায় উচচ হারে এবং বড় অবস্থায় নিম্ন হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

কুচিয়া চাষে নিম্নরূপভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে ঃ

খাবারের ধরণ	প্রয়োগ হার (দেহ ওজনের)	প্রয়োগ সময়কাল
কার্প মাছের জীবিত ধানী পোনা	৩.০%	১৫ দিন অন্তর
শুটকী (ফিশমিল)	১.০%	১ দিন পর পর
শামুক/ঝিনুকের মাংস ও ছোট মৃত মাছ	১.০%	২ দিন পর পর
লাল কেঁচো	১.৫০%	প্রতিদিন
গুতুম মাছ, ছোট শামুক, জলজ কীটপতঙ্গ	১.০%	২ দিন পর পর

সদস্য পর্যায়ে কুচিয়া মাছ চাষ প্রদর্শনী স্থাপনে সম্ভাব্য বাজেট (ডিচ মডেল) ঃ

কুচিয়া চাষের জন্য ডিচের সাইজ/আকার ও দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট ও গভীরতা ৩ ফুট বিশিষ্ট

ক্র:/নং	বিবরণ	মোট টাকা
০১	ডিচ/গর্ত খনন/তৈরীতে শ্রমিক মজুরী	২০০০
০২	ত্রিপল (৩০ গজ) *১৫০/- টাকা	৪৫০০
০৩	ডিচ আচ্ছাদনের জন্য ঘন মেস সাইজের নেট/জাল ক্রয়	১৫০০
০৪	বাঁশ ক্রয়	১০০০
০৫	কুচিয়া মাছ ক্রয় (২৫ কেজি * ১৫০/-)	৩৭৫০
০৬	কুচিয়ার খাবার (কার্প ও তেলাপিয়া মাছের পোনা ক্রয়)	৫০০
০৭	ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপন (কেঁচোসহ ২টি রিং)	৫০০
০৮	প্রদর্শনীতে সাইনবোর্ড স্থাপন (৩.৫ ফুট * ২.৫ ফুট)	৫০০
০৯	কুচিয়া ধরার জন্য ত্রিকোণাকার ফাদ তৈরী/ক্রয়	১৫০
১০	রকর্ড বুক তৈরী বাবদ (সদস্য পর্যায়ে তথ্য সংরক্ষণ)	৫০
১১	প্লাষ্টিকের পাইপ, বাশের চোঙ ও মাটির হাড়ি ক্রয় (ডিচে কুচিয়ার আশ্রয়স্থল-এর জন্য)	২৫০
১২	অন্যান্য ব্যয় (যদি লাগে)।	৩০০
	সর্বমাট খরচ	১৫,০০০

আয়: ২৫০ কেজি কুচিয়া যার বাজার মুল্য ২০০/= করে মোট আয়=৫০,০০০/= টাকা এক মৌসুমে লাভ (৫০০০০-১৫০০০)= ৩৫০০০/= টাকা অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়।

সার আলোচনা :

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দু:স্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ করার জন্য অনুরুপ কোন উৎসে অংশগ্রহনের সুযোগ আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক এ প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহনমূলক গ্রামীন সমীক্ষা কৌশল (পিআরএ) অনুসরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আয় বৃদ্ধি অনেকাংশেই নিশ্চিত হয়। ভিশন ২০২১ এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহন ২৫-৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যেও এ প্রশিক্ষণ কার্যকর ভুমিকা রাখবে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর মাছ চাষের আত্নবিশ্বাস ও সামর্থের ধারনা জন্মাবে। সিদ্ধান্ত গ্রহনের সামর্থ ও একসাথে কাজ করার দক্ষতা তৈরী হবে। পরিবারে ও সমাজে সে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহনেরর মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব হবে।